ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা ।। ২৪ আশ্বিন ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১১ অক্টোবর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির ছিল, আছে, থাকবে

রামমন্দির নির্মাণে সকলে সামিল হোন —শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অযোধ্যায় জমির মালিকানা সম্পর্কিত মামলায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের রায় দানের অব্যবহিত পরই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক, মাননীয় শ্রী মোহনরাও ভাগবত এক বিবৃতি দেন এবং সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র নাগপুরে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন। সেই বিবৃতিটি হুবহু উদ্ধৃত করা হলো— "শ্রীরামজন্মভূমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আদালতে বাদানুবাদ চলছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ উচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছেন তাতে মর্যাদাপুরুষোত্তম

(এরপর ৪ পাতায়)

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অযোধ্যায় ভগবান রাম-এর যে অস্থায়ী মন্দির রয়েছে তা হিন্দুদের এবং বাবরি মসজিদ অবৈধ কাঠামো— গত ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ যে যুগান্তকারী রায় দিয়েছে এটাই হলো তার সংক্ষিপ্তসার। পুরাতত্ত্ব বিভাগের পেশ করা তথ্য উদ্ধৃত করে তিনজন বিচারপতিই এক বাক্যে রায় দিয়েছেন যে ওই জমি রামেরই জন্মভূমি। হিন্দুদের বিশ্বাসও তাই। ওই স্থান থেকে আর কখনই রামলালার মূর্তি সরানো যাবে না। ওই জমির মালিক রামলালাই। বস্তুত এই রায়ে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরাম এবং তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যার প্রতি ভারতীয় জনমানসের সনাতন আস্থার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। এক কথায়, অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ছিল, আছে ও থাকবে। রায় ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে অযোধ্যার ওই জমিতে সুরম্য রামমন্দির নির্মাণে সকল দেশবাসীকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বেশ কয়েক হাজার পৃষ্ঠার রায় কলকাতায় বসে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। তবে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নেতা-রাজনেতা-পণ্ডিতরা যেভাবে আলাপ আলোচনা করে সময় কাটিয়েছেন তার ফলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। কেননা রাজ্যের শাসকদলের কয়েকজন নেতা ও তাদের সমর্থক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যেখানে নিজেরাই বিভ্রান্ত সেখানে তাঁরা কীভাবে আম-জনতার বিভ্রান্তি নিরসন করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

এলাহাবাদের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের তিন বিচারপতি ছিলেন— মহামান্য বিচারপতি শিবগাতউল্লা খান, বিচারক সুধীর আগরওয়াল এবং বিচারপতি ধরমবীর শর্মা। তাঁদের বিচার্য বিষয় নির্দিষ্ট ছিল— (১) ১৫২৮ সালে তৈরি মসজিদের স্থানে কোনও হিন্দু মন্দির ছিল কি?

এই প্রশ্নে তিনজন বিচারপতিই একবাক্যে বলেছেন, ওখানে একদা রামমন্দিরই ছিল। অবশ্য বিচারপতি শিবগাতউল্লা খান বলেছেন, হিন্দুধর্মীয় কাঠামো ছিল। রায়দানের অব্যবহিত পরেই এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অ্যাডভোকেটরা মিডিয়া সেন্টারে এসে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের কয়েকজনের বক্তব্য— কেন্দ্র সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রদত্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের ওই সিদ্ধান্ত। সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ডের সিদ্ধান্ত খারিজ করে মাননীয় বিচারপতিদের মন্তব্য— তথাকথিত বাবরি মসজিদের প্রধান গম্বুজের নীচে গর্ভগৃহে রামমন্দিরই ছিল একসময়। আর সেটিই প্রকৃতপক্ষে রামের জন্মস্থান বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। সুতরাং ওখান থেকে কখনই রামলালার মূর্তি সরানো যাবে না। ওই জমির মালিক রামলালাই। এখানেই দ্বিতীয় প্রশ্ন— ওই বিতর্কিত জমিই কি রামের জন্মস্থান? তারও বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে জানিয়ে বলেছেন— রামের মূর্তি থাক বা না থাক ভক্তদের বিশ্বাসই বড় কথা। রামজন্মভূমিতে রামের আরাধনা হিন্দুদের অধিকার। এই সমস্যার নিদানও হয়ে গেছে। এমনকী বিচারপতিরা মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরিকে ইসলামের উদার নীতির বিরোধী বলেছেন। ফলে এবার থেকে

(এরপর ৪ পাতায়)

রায় নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে

হি.স. ঃ কলকাতা।। অযোধ্যার রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদের জমি সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের মতোই রায়ের প্রভাবে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আশঙ্কাও করা হয়েছিল সেদেশে। বাংলাদেশের সর্বত্র মানুষ সংবাদ মাধ্যমে রায় জানার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সেদেশের আইনজীবীদের একাংশে এই রায়কে 'রাজনৈতিক' রায় বলে অভিহিত করেছে। আবার অনেক আইনজীবীকে রায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে অনীহা প্রকাশ করতে দেখা গেছে বলে বাংলাদেশের এক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে। অযোধ্যার জমি সংক্রান্ত মামলার এই রায়কে সে দেশের শাসক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউসুফ হোসেন

(এরপর ৪ পাতায়)

নিজের ফেলা থুতু চাটছে সেকুলার সংবাদমাধ্যম

গুড়পুরুষ।। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে চলা রাম জন্মভূমির মালিকানা মামলার রায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট দিয়েছে। আদালতের রায়ের পর একটিও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অথচ দেশের মিডিয়া যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার আশঙ্কা ছড়িয়ে ছিল তাতে সুরক্ষার নামে পুলিশের হাতে নাকাল হতে হয়েছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে। বাস্তবে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বাদী-বিবাদী কোনও পক্ষই কড়া সমালোচনা করেনি। আর এতে হতাশ দেশের সংবাদমাধ্যম এবং সেকুলারবাদী সাংবাদিকরা। তাঁদের এখন নিজের ফেলা থুতু নিজেদের চাটতে হচ্ছে। তবে বোধহয় সবচেয়ে হতাশ নিজেদের জাতীয় সংবাদপত্র বলে দাবি করা বড় বড় শিল্পপতিদের পরিচালিত ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি।

হতাশার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ রায় দেয় ৩০ সেপ্টেম্বর। পরের দিন পয়লা অক্টোবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রথম পাতায় প্রধান খবরের শুরুতেই লেখা হয় একদা 'গায়ের জোরে' বাবরি মসজিদের মূল বা কেন্দ্রীয় গম্বুজের ভিতরে যে রামলালার মূর্তি বসানো হয়েছিল আদালত তাকেই বৈধতা দিয়েছে...ইত্যাদি। অথচ উচ্চ আদালতের রায়ের কোথাও বলা নেই যে রামলালার মূর্তি হিন্দুরা 'গায়ের জোর' দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল। রায়ে শুধুই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয় যে বর্তমানে যে রামলালার পূজা চলছে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর রাত্রে। এর অতিরিক্ত কিছু বলা হয়নি। অথচ ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজি দৈনিকটির উচ্চ বেতনভোগী সাংবাদিকটি কল্পনা করে নিলেন যে হিন্দুরা পেশি শক্তি দেখিয়ে বাবরি মসজিদের মূল অংশে রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হ্যাঁ, সাংবাদিকটি একজন হিন্দু এবং সেকুলারবাদী। দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এই ছদ্ম সেকুলারবাদীরাই ছড়াচ্ছে।

একটা কথা নবপ্রজন্মের সাংবাদিকদের অবশ্যই মনে রাখা ভাল যে অন্য সব পেশার মতোই সাংবাদিকতার একটা নৈতিক ধর্ম আছে। এই ধর্ম বা 'এথিক্স্' অনুসারে আদালতের রায় অবিকৃতভাবে লিখতে হবে। সাংবাদিকের ব্যক্তিগত মতামত, পছন্দ অপছন্দ আদালতের রায়ের বয়ানে কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। তাতে শুধুই যে পাঠকদের বিভ্রান্ত করা হয় তাই নয়, এটি আদালত অবমাননার অপরাধও বটে। সাম্প্রতিককালে চিকিৎসক, সাংবাদিকদের উপর যে সব হামলা নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে তারজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী পেশাগত নৈতিক ধর্ম মেনে না চলা। এই কিছু নৈতিক ধর্ম হারানো লোকের জন্য বদনাম হচ্ছে সমগ্র পেশার। ভারতীয় সাংবাদিকদের অজানা নয় কেন প্রেস, পুলিশ, পলিটিসিয়ানস্ সমাজে আজ সম্মান হারিয়েছে। এই 'পি-৩'-র সঙ্গে এখন ফিজিসিয়ানদের নামও যুক্ত হতে চলেছে।

(এরপর ৪ পাতায়)

দেগঙ্গা ব্লকে পুজো হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেগঙ্গা ব্লকের ২৪টি সার্বজনীন পুজো কমিটি এবছর মুসলমানদের একতরফা হামলা করার প্রতিবাদে দুর্গাপুজা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন এবং তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে পুজো করানোর জন্য যাবতীয় কৌশল-অপকৌশল পরোক্ষ চাপ অব্যাহত রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দেগঙ্গার এক গ্রামীণ তৃণমূল কর্মী একথা জানিয়েছেন। হিন্দু তৃণমূলীরা জানা-চেনা, পরিচিত মুসলমান তৃণমূল কর্মীদের প্রকাশ্যে হামলা, লুটপাঠ, মা-বোনেদের শ্লীলতাহানি এবং তৃণমূলের নেতাদের ওই হামলায় নেতৃত্ব দেওয়া মেনে নিতে পারছেন না।

১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন দীর্ঘদিন কোনও হিন্দু সংগঠনের সদস্য-নেতা-কর্মীদের দেগঙ্গায় ঢুকতে দেয়নি। অথচ তৃণমূলের সাংসদদের, যুবনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে মিছিল-মিটিং করতে দিয়েছে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই একতরফা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠছে স্বাভাবিকভাবেই।

এদিকে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ২৮ জন হিন্দু, যাদের বাড়ি-ঘর-দোকান লুটপাট হয়েছে তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাদের অভিযোগের প্রতিলিপি স্বস্তিকা দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। তবে হিন্দুরা যে কয়জন মুসলিম দুষ্কৃতীর নামে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তাদেরকে দেগঙ্গার পুলিশ খুঁজে পায়নি। এরকম একজন নেতৃত্ব প্রদানকারী বিশ্বনাথপুর গ্রামের মফলুকার রহমান (পিতা— হবিবর রহমান)। সে প্রকাশ্যে মোটরবাইক চড়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালেও পুলিশের চোখে পলাতক। এসবের ফলে ঘটনা ঘটার প্রায় একমাস পরেও হিন্দুরা ভীত-সন্ত্রস্ত। সুতরাং পুজোর প্রশ্নই উঠছে না। এদিকে যেখানে বিগত ৪০/৪৫ বছর যাবৎ দুর্গাপুজো দেগঙ্গার চট্টলপল্লীতে হয়ে আসছিল সেই জায়গাটার অনেকাংশে

(এরপর ৪ পাতায়)

বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে
হিন্দুদের এলাকাছাড়া করতেই দেগঙ্গায় আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা।। দেগঙ্গায় গত ৬-৭ সেপ্টম্বরে হিন্দুদের উপর এই আক্রমণ ছিল পরিকল্পিত। আক্রমণের পরিকল্পনা চলছিল বহুদিন পূর্ব থেকেই। প্রশাসন যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন, আসলে এসব হচ্ছে ইসলামী আগ্রাসনের প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা থেকে হিন্দুদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়েছে, যে প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে নদীয়ার সীমান্ত এলাকায় হিন্দুদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, সেই একই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট থেকে বারাসত পর্যন্ত হিন্দু উচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে। এমনিতেই বারাসত থেকে বসিরহাট সীমান্ত পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ব্লক মুসলমান অধ্যুষিত। এই ব্লকগুলিতে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা কম, তবুও যে কয়ঘর হিন্দু বসবাস করছে তাদের হঠাতেই এই আক্রমণ। এটা সবে শুরু মাত্র; ভবিষ্যতে এরকম আক্রমণ আরও বাড়বে। এসবই ইসলামীস্থান গঠনের অঙ্গ। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁর কলোনি থেকে বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এরমধ্যে অধিকাংশই স্থল এলাকা। আসলে এখনও সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। মূলত বনগাঁর কলোনি, স্বরূপনগরের তারালি, নপদকাঠি, হাকিমপুর, গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা, তারজালা, গোবরা বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় দিব্যি চলছে যাতায়াত, চোরাচালান, মেয়েপাচার প্রভৃতি। ধীরে ধীরে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে বসিরহাট থেকে বারাসত পর্যন্ত নানা এলাকা। আর উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় যে সিমির সংগঠন গোপনে কাজ করে চলেছে তা কেন্দ্রকে ২০০৮ থেকে বহুবারই রিপোর্ট পাঠিয়েছে রাজ্য গোয়েন্দারা। উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন এলাকায় হুজি ও সিমির কার্যকলাপ যে খুব গভীরে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০০১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)র সঙ্গে যুক্ত ও সংগঠনের হয়ে ভারতবিরোধী

দেগঙ্গায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে মহিলাদের বিক্ষোভ।

কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে আবদুল আজিজ ও আবদুল মজিদ অন্যতম। এর কিছুদিন পরে বাদুড়িয়ার পদ্মপুকুরে সিমির একটি গোপন বৈঠক থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কামারুজ্জমান ও সিরাজুল ইসলামকে। কিন্তু এই সময় পুলিশ ধরতে পারেনি সিমির জেলা সম্পাদক আবদুল মতিমকে। অথচ বিভিন্ন নামে ছদ্মবেশে বহুবার আবদুল মতিম বিভিন্ন মজলিসে অংশগ্রহণ করেছে বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর রয়েছে। দেগঙ্গা ব্লকেও সিমির মজবুত সংগঠন এখনও বিভিন্ন নামে কাজ করছে বলে গোয়েন্দাদের অভিমত। গত এপ্রিলে কদম্বগাছিতে এক মজলিশে বাংলাদেশি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের কিছু সদস্যকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। রাজ্য গোয়েন্দাদের মতে এই সীমান্তবর্তী এলাকায় একের পর এক গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও সিমি কিংবা হুজির অনেক সক্রিয় সদস্য যুক্ত থাকায় সমস্যা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলো নিছক দলীয় ভোট ব্যাঙ্কে ভোটার বাড়ানোর লক্ষ্যে এই অবৈধ কার্যকলাপকে উৎসাহিত করছে। বস্তুত বারাসত—বসিরহাট রুটের দেগঙ্গা থেকে কদম্বগাছি মধ্যেকার কয়েক কিলোমিটার এলাকায় গত দশ বছরে জনবিন্যাসে যে পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্য করার মতো। নানা সমস্যায় হিন্দুর সংখ্যা যেমন কমতে আরম্ভ করেছে তেমন বেড়েছে মসজিদ মাদ্রাসার সংখ্যা। গত তিন বছরে দেগঙ্গা ব্লকে ৭টি হিন্দু মেয়ে নিখোঁজ হয়। হিন্দুবাড়ীতে চুরির সংখ্যা ২৭, ডাকাতি ৫। আর এই সমস্ত সূত্র ধরেই দেগঙ্গা ব্লক আগামীদিনে হয়ে উঠতে চলছে সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য। ধীরে ধীরে মিনি পাকিস্তান হয়ে উঠতে চলছে বসিরহাট সীমান্ত।

এই সময়

ভোটার মুসলিম, প্রার্থী হিন্দু

গুজরাটের গোধরা পুরসভার নির্বাচনে এবারে মুসলিমরাই স্বেচ্ছায় এক হিন্দু মহিলা প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে নিজেদের এলাকার উন্নয়নে প্রয়াসী হচ্ছেন।

আগামী মাসেই হতে চলেছে গুজরাটের পৌরসভা নির্বাচন। এবারের এই নির্বাচন অন্যবারের তুলনায় একটু ব্যতিক্রমী। কারণ পৌরপ্রধান পদে কোনও মুসলিম প্রার্থীকে নয়, খোদ্ হিন্দু নারীকে ভোট দিয়ে পৌরপ্রধানের আসনে বসাতে চান গুজরাটের গোধরার মুসলিম সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। মুসলিমদের ভোটে মনোনীত হবে হিন্দু নারী—এও কি সম্ভব? মুসলিমদের দাবি— ''বছরের পর বছর বঞ্চনা ও অনুন্নতির অন্ধকারে থাকতে থাকতে আমরা ক্লান্ত। মহিলাদের তুলনায় পুরুষরাই বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত।'' তাই এবার কোনও পুরুষ নয়, একজন হিন্দু নারীকেই তাঁরা দেখতে চান এলাকার পৌরপ্রধান হিসেবে। তাঁদের বিশ্বাস একজন মহিলা পৌরপ্রধানই পারবে তাঁদেরকে উন্নতির আলো দেখাতে।

ভারতে সি আই এ প্রধান

সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি (সি আই এ) প্রধান লিওন পানেট্টা। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম সহ নর্থ ব্লকের একাধিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। গোয়েন্দা প্রধান রাজীব মাথুর এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা'র প্রধান কে সি ভার্মা-র সঙ্গে আলোচনায় পানেট্টা ভারত-মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদান এবং 'কাউন্টার টেররিজম' নিয়ে জোর দেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। আফ-পাক নীতি নিয়েও পানেট্টা এদেশের সরকারি কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। কূটনৈতিক মহল মনে করছেন, দু'দেশের গোয়েন্দারা সন্ত্রাসবাদ দমনে যতই সক্রিয় হবার বার্তা দিন না কেন আসল গলদটা কিন্তু রয়েছে ওবামা ও মনমোহন প্রশাসনে।

অভব্য আমেরিকা

ফের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে অপমান করে নিজেদের বিশৃঙ্খলতা, অভব্যতা ও কুরুচিপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি, ওয়াশিংটনের একটি জুতো প্রস্তুতকারক সংস্থা প্রয়াত গীটারশিল্পী জিমি হেনড্রিক্সের নামে একধরনের নতুন জুতো আমেরিকার বাজারে এনেছে। জিমি হেনড্রিক্সের নামাঙ্কিত এই জুতোয় ব্যবহার করা হয় হিন্দু দেবদেবীদের বিভিন্ন ছবি। সংস্থাটির এহেন কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন।

অগত্যা, নিজেদের মান বাঁচাতে রাতরাতি জুতোর বিক্রি বন্ধ করে সংস্থাটিকে ক্ষমা চাইতে হয় আমেরিকার হিন্দু সমাজের কাছে। সংস্থাটির দাবি 'তাদের এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত নয়।' নিজেদের উন্নত বলে গোটা বিশ্বের সামনে বড়াই করলেও, এখনও যে মানসিকতার দিক দিয়ে তারা কতটা নিম্নরুচি সম্পন্ন, তারই নগ্নপরিচয় সারা বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জীবন-নাশক

শরীরকে সুস্থ রাখতে বহু মানুষ আছেন যাঁরা নিয়মিত ভিটামিন পিল বা ভিটামিন বড়ি খান। কিন্তু তাঁরা যে নিজেদের অজান্তেই এগিয়ে চলেছেন এক মারণ রোগের দিকে, একথা বোধহয় তাঁরা নিজেরাও জানেন না। চিকিৎসকদের ভাষায় রোগটিকে 'ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা' বলা হলেও, সাধারণ মানুষ রোগটিকে স্কীন ক্যান্সার বলেই জানেন।

হ্যাঁ, সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছেন ফ্রান্স, বর্ডি আল্পের ন্যাশানাল সেন্টার ফর রেয়ার স্কীন ডিজিসেসের গবেষকমণ্ডলী। তাঁদের মতে, ভিটামিন বড়ি বা পিলের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও মিনারেলের মতো পদার্থ থাকার দরুণ মানুষের শরীরে এই বড়ি প্রবেশ করে স্কীন ক্যান্সারের মতো রোগের সূত্রপাত ঘটায়।

তবে এই রোগের বাহক হিসেবে 'ডামি পিলে'র তুলনায় 'ভলেন্টিয়ার পিল'কেই এগিয়ে রাখছেন তাঁরা। কারণ ভলেন্টিয়ার পিলে থাকে ভিটামিন-'ই', অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, বিটাক্যারোটিন, সিলেনিয়াম ও জিঙ্কের মতো পদার্থ যা এই রোগের সম্ভাবনাকে চারগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ক্যান্সারের যম

নিয়মিত 'অ্যাস্প্যারিন' ব্যবহার করলেই আপনি থাকতে পারবেন ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের কবল থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে। এমনটাই জানাচ্ছেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ম্যালকম ডানলপ।

ডানলপের কথায় ''স্বল্প-পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পন্ন এই ঔষধটি ব্যবহারের ফলে দেহের ভেতরের যে কোনও অংশে ক্যান্সারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। প্রায় ৭৫ এম জি অ্যাসপিরিন নিয়মিত ব্যবহারের ফলে ২৫ শতাংশ ক্যান্সারের সম্ভাবনাও কমে যায়।''

দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে তিনি এই বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।

থেরাপীর 'টার্গেট'

এবার মলাশয় ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বাজারে আসতে চলেছে টার্গেট থেরাপী। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ''কলকাতার সমস্ত ক্যান্সার আক্রান্ত রুগিদের মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশই এই রোগের শিকার।''

শুধু মলাশয় ক্যান্সারই নয়, রুগির শরীরে ক্যান্সার সেলের বৃদ্ধিকেও রুখবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি। এমনটাই সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন টার্গেট থেরাপী নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করা চিন্ময় বোস। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গবেষক চিন্ময়বাবুর কথায় ''একটি জিনের সাহায্যে কার্যকর করা হবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি ''। সুইডেনের গবেষকদের পরিচালনায় ১৬ জন ক্যান্সার আক্রান্তের ওপর এনিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া মেলে একথাও জানান তিনি।

মূলত, এই রোগ নিরাময়ের জন্য দু'ধরনের জিন কার্যকরী—মিউটেটেড ওয়াইল্ড জিন, যার মধ্যে দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকরী।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সত্যের জয়

এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে র গত ৩০ সেপ্টেম্বর দেওয়া অযোধ্যায় রামজন্মভূমি সংক্রান্ত মামলার রায়কে দেশের মানুষ সাধুবাদ জানাইয়াছে। আবেদনকারীদের আনীত ও আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট জটিল মামলাটি বিচারপতি শিবগাত -উল্লা খান, বিচারপতি সুধীর আগরওয়াল এবং বিচারপতি ধর্মবীর শর্মা যুক্তিসঙ্গতভাবে মীমাংসার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। এই রায় আইনের মহিমাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বিচারবিভাগের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তি প্রদান করিয়াছে। মাঝে-মধ্যেকার কয়েকটি বিচ্যুতিকে ব্যতিক্রম ধরিলে আমাদের দেশের বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানটি সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, গত ষাট বৎসর ধরিয়া মামলাটিকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং এই বিলম্বের কারণে মামলাটি ক্রমশ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনজন বিচারক আর দেরী না করিয়া মামলাটির রায় ঘোষণার কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই রায় ঘোষণার পরও মামলার বাদী-বিবাদী পক্ষ সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারেন, বিশেষত এখন তাহারা এই পরিকল্পনার কথাই বলিতেছেন। কিন্তু তাহাতে উচ্চ আদালতের দেওয়া মূল রায়ের বিশেষ কোনও ব্যত্যয় ঘটিবে না।

রামজন্মভূমি আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেই তথ্যানুযায়ী অযোধ্যায় তথাকথিত বাবরি ধাঁচার স্থলেই রামমন্দির ছিল। আদালত ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে গর্ভগৃহে যেখানে রামলালা পূজিত হইতেছেন সেখানে হইতে তাহাকে সরানো যাইবে না। ইহা রামজন্মভূমিই। সেইসূত্রে রাম চবুতরা ও সীতা রসুই-এর পবিত্রতাও স্বীকৃত। বস্তুত তথাকথিত বিতর্কিত ৯৩১৩০ বর্গফুট জমিসহ সরকার অধিগৃহীত সম্পূর্ণ ৭০ একর জমিই বিরাজমান শ্রীরামলালার জন্ম, ক্রীড়া ও লীলাস্থল। তাই এই পরিসরের বিভাজন কিংবা অন্য কোনও ধর্মীয় মতাবলম্বীদের উপাসনা স্থল হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত হইবে না।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম ভারতরাষ্ট্রের সংস্কৃতি-পরম্পরা, পৌরুষ-পরাক্রম, একতা এবং অখণ্ডতা তথা সামাজিক সৌহার্দ্যের প্রতীক এবং আস্থার কেন্দ্র। অন্যদিকে ইতিহাসের নির্মম সত্য হইল বাবর এক বিদেশী আক্রমণকারী যে ভারতের স্বাভিমান ও আত্মপরিচিতিকে পদদলিত করিবার জন্য শ্রীরামজন্মভূমির মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদের মতো কাঠামো তৈয়ারি করিয়াছিল। ভগবান রাম হিন্দুসমাজ তথা ভারতের আত্মাস্বরূপ। তাই নিজেদের স্বাভিমান ও শ্রদ্ধাবিন্দুর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এখন সময় আসিয়াছে, সকল রাজনৈতিক দলকেই এই সত্য স্বীকার করিতে হইবে শ্রীরাম ভারতরাষ্ট্রের সর্বস্ব— রাম ব্যতীত ভারতকে কল্পনা করা যায় না। ইহা একটি শুভ সঙ্কেত যে মুসলিমদের একাংশ বলিতেছেন, সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ না হইয়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রামলালার গোটা চত্বরটা হিন্দুদের ছাড়িয়া দিয়া বরং অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে মসজিদ নির্মাণ করা হোক। শ্রীরামলালা বর্তমানে যেভাবে পূজিত হইতেছেন, কোটি কোটি হিন্দুর কাছে তাহা অসহনীয় এবং অপমানজনক। তাই অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমিতে সুরম্য মন্দির নির্মাণের প্রশ্নে স্পষ্ট নীতি অবলম্বন করাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইজন্য সব রাজনৈতিক দলের সাংসদেরা একমত হইয়া সোমনাথ মন্দিরের মতো সংসদে আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করুন। স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথমদিকে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও স্বাভিমান রক্ষার জন্য যে দূরদর্শিতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের উত্তরসূরীরাও সেই পথ অনুসরণ করুক।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলন ভূমি, ওই ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হবেই। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ওই ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্য সাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্র সকলকে একধর্ম স্বীকার করিতে হইবে। একধর্ম—একথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খৃষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধ গণের ভিতরে যে অর্থে একধর্ম বিদ্যমান আমি সে হিসাবে একধর্ম কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে— যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায় সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ওইগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম, সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাবে পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে। আমরা সকলে ইহা জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারাই ইহা জানেন। আমরা চাই— আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক, সকলেই সেগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কাশ্মীরে অশান্তির পেছনে রয়েছে পাকিস্তানের চক্রান্ত

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত তিনমাস সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা অশান্ত। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে তরুণরা রাস্তায় নেমে 'আজাদির' দাবী করছেন। সুরক্ষা কর্মীদের উপর পাথর বৃষ্টি করছেন। রাজ্য প্রশাসন 'কারফিউ' জারি করেছেন, কিন্তু 'কারফিউ' উল্লঙ্ঘন করে তরুণদের পাথর বৃষ্টি ছিল অব্যাহত। মাঝে মধ্যে পুলিশের গাড়ীতে অগ্নি সংযোগ, থানা, পুলিশ চৌকির উপর হামলা। পুলিশ, সি আর পি এফ লাঠি প্রহার কাঁদানে গ্যাস এবং নিরুপায়ে গুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। রবারের গুলিতে মানুষ আহত হচ্ছেন কিন্তু অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে গুলি চালনায় প্রায় প্রতিদিনই দু'চার জন আন্দোলনকারী নিহত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। সামরিক অধিকর্তা বলেছেন, অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরও প্রশাসন সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সচল না করার অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এই পাথর বৃষ্টির আন্দোলন, আইন অমান্য এক নতুন ধরনের সন্ত্রাসের চেহারা। জানা যায় প্যালেস্টাইনে এই ধরনের সন্ত্রাসের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনী নাজেহাল। তাদেরও বহু সদস্য পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন। সাধারণ নিরপরাধ কাশ্মীরের মানুষ চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন। কারফিউ সেইসঙ্গে আন্দোলন, গুলি চালনা, মৃত্যু চক্রবৎ ঘটে চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠেছে। পর্যটকরা কাশ্মীরকে বাদ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সুরক্ষা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। কিছু সংগঠন দাবী করছেন সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন তুলে নিতে হবে। কাশ্মীরের ওমর আবদুল্লা সরকার মনে করেন, যদি এই আইন তুলে নেওয়া হয়, অথবা কয়েকটি ধারার পরিবর্তন করলে জনরোষ কিছুটা শান্ত হবে।

এই বিশেষ অধিকার আইনের বলে, সামরিক বাহিনী কোনও অঞ্চল ঘিরে ফেলতে, তল্লাসী করতে, গ্রেপ্তার করতে পারবে। আত্মরক্ষার্থে এবং পলায়নপর সন্ত্রাসবাদীকে গুলি করতে পারবে। এই শক্তি প্রয়োগের জন্য কেউ হতাহত হলে কোনও আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না। সামরিক বাহিনী মনে করে এই রক্ষাকবচ তুলে নিলে বাহিনী অকেজো হয়ে পড়বে এবং সত্য ও মিথ্যা মামলায় তারা জেরবার হবেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে শহরাঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর এই ক্ষমতার আড়ালে কোনও হতাহত হওয়ার ঘটনাই ঘটেনি। বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায় বিগত প্রায় তিনমাস যাবৎ আন্দোলনের মোকাবিলা করছে রাজ্যপুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী, অথচ দাবী উঠছে, সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন তুলে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের অশান্তি দূর করার প্রয়াসে সর্বদলীয় বৈঠক করেন। জম্মু কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লাহ (এন সি) এবং মেহবুবা মুফতি (পিডিপি) সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল আলোচনায় যোগদান করেন। কিন্তু ফলপ্রসূ কোনও সূত্র বেরিয়ে আসেনি। বিজেপি সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন রদ করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। সর্বদলীয় আলোচনায় স্থির হয়, সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল কাশ্মীরে গিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক দল, হুরিয়তের মতো সংগঠন এবং অন্য সমস্ত মানুষের বক্তব্য শুনবেন। তবে এই প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ফললাভ হবে আশা করা যায় না। কারণ হুরিয়তের উভয়গোষ্ঠী আজাদির দাবীতে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। বিশেষ করে সৈয়দ আলি শাহ জিলানী শুধুমাত্র বিশেষ অধিকার আইনই নয় সমগ্র সামরিক বাহিনীকেই কাশ্মীর থেকে তুলে নিতে হবে বলে দাবী করেছেন। সৈয়দ আলি শাহ জিলানী বহুদিন ধরেই জম্মু কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তির দাবী করে আসছেন। তাঁর

এ বছরের গোড়া থেকেই গোয়েন্দাসূত্র অনুযায়ী বহু সংখ্যায় পাকিস্তানী জেহাদিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখনও তারা নিরন্তর অনুপ্রবেশের প্রয়াস করে চলেছে। ফলে এই আন্দোলন স্থানীয় কাশ্মীরিদের একক আন্দোলন নয়।

পক্ষে অন্যকিছু বলাও বোধহয় সম্ভব নয়, তিনি পাকিস্তানের বদান্যতায় তাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে বিক্রীত। ফলে অন্য কথা বললে মৌলভী ফারুকের পিতার পথেই তাঁকে যেতে হবে। পাকিস্তানী জেহাদিদের কাছে তাঁর প্রাণের মূল্য কিছুই থাকবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করছেন, ভারতের সংবিধানের ভিতরে জম্মু কাশ্মীরে যা কিছু করা প্রয়োজন, তিনি তার জন্য প্রস্তুত। হিংসা ত্যাগ করে আলোচনায় আসতে হবে।

এ বছরের গোড়া থেকেই গোয়েন্দাসূত্র অনুযায়ী বহু সংখ্যায় পাকিস্তানী জেহাদিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখনও তারা নিরন্তর অনুপ্রবেশের প্রয়াস করে চলেছে। ফলে এই আন্দোলন স্থানীয় কাশ্মীরিদের একক আন্দোলন নয়। আরও এক সূত্রে খবর, রয়েছে প্রায় দশ হাজার কাশ্মীরি কিশোর, যুবক যারা জেহাদি এবং আই এস আইয়ের প্ররোচনায় মাসিক বেতনের লোভে পাকিস্তানে জেহাদি কর্মশালায় যোগদান করেছিলেন, তাঁদের নাকি স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, তাঁরা ফিরে এসে ভারতের মূলস্রোতে মিশতে চান। আসলে অনুপ্রবেশের মূল বাধা ভারতের সেনাবাহিনী। দিবারাত্র প্রাণের বিনিময়ে তারা অনুপ্রবেশের মূল পথগুলি এমনভাবে আগলে রেখেছেন যার ফলে বহুসংখ্যায় অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ নিয়ে অনুপ্রবেশ কঠিন হয়ে গিয়েছে। ফলে যদি সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন তুলে নেওয়া হয় অথবা শিথিল করা হয় তাহলে সামরিক বাহিনী সমস্যায় পড়বেন এবং রক্ষণাত্মক হয়ে পড়বেন। তাঁদের তেজ প্রশমিত হবে এবং তাঁরা অকারণ ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। মিথ্যা মামলা দায়ের করা এরাষ্ট্রে একটা মসৃণ কলায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সৈনিকরা খোলাখুলি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অপারগ। ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপার থেকে পাকিস্তান সরকার সোচ্চার হয়েছেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই আরম্ভ হয়েছে। এবং আগামীদিনে সেই লড়াই আরও জোরদার হবে।

দু'বার কাশ্মীর দখলের লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তান চোরাগোপ্তা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। হাজার ক্ষত সৃষ্টি করে ভারতীয় রক্তক্ষরণের স্ট্রাটেজির আরও একটা অভিনব উপায় এই প্রস্তর বৃষ্টির আন্দোলন। আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান কারগিলের নিয়ন্ত্রণ রেখা পার হয়ে কারগিলের ভারতীয় ঘাঁটিগুলি চোরের মতো দখল করেছিল। ভারতের সামরিক বাহিনী বহু ত্যাগ স্বীকার করে সেগুলি পুনরুদ্ধার করেছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের কোনও ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে শুধুই মিথ্যাচার। মুম্বই হামলা, জার্মান বেকারী হামলা ইত্যাদি তারই নিদর্শন। পরমাণু বোমা তৈরিও সেই চুরির ফসল। সেখানে গণতন্ত্র আই এস আই এবং সামরিক বাহিনীর নির্দেশে চলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা গোপনে বলেও দিয়েছিল, জেহাদি সন্ত্রাসবাদ তারা ত্যাগ করবে না, ভারতের বিরুদ্ধে এটাই তাদের সুরক্ষা এবং দাবী আদায়ের অস্ত্র।

ভারতের গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং অধিকারের সুযোগে গিলানীর মতো মানুষ খোলাখুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেও বহাল তবিয়তে রয়েছেন, কিসের প্রলোভনে কাশ্মীরের মানুষকে তিনি সেই বিফল রাষ্ট্রে যোগদানের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলছেন? অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ কোন সুখদ গণতন্ত্র ভোগ করছেন?

আমার বিশ্বাস এই আন্দোলনের পিছনের নেতাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি বিধান করার প্রয়াস করতে হবে। কাশ্মীরের শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনে অনাবশ্যক যন্ত্রণা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। কিশোর এবং তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পর্যটন শিল্প, পশম শিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রয়াসগুলিকে জোরদার করতে পারলে, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের পেটোয়া হুরিয়তি এবং জেহাদির বিরুদ্ধেই সোচ্চার হওয়ার সাহস পাবেন। সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিরা কি মীমাংসার সূত্র পাবেন জানি না, কিন্তু পাক জেহাদিদের কাশ্মীর থেকে নির্মূল করতে সামরিক বাহিনী এবং অন্য সুরক্ষা কর্মীদের হাত শক্ত করাই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

থুতু চাটছে সেকুলার সংবাদমাধ্যম

(১ পাতার পর)

এখনও সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে আরও লাঞ্ছনা কপালে আছে।

এই মামলায় কোনও পক্ষই বলতে পারে না যে তাদেরই জয় হয়েছে অথবা হার হয়েছে। হ্যাঁ, প্রত্যাশা ছিল পুরো রাম জন্মভূমি এলাকাটাই (২.৭৭ একর) অধিকারে পাওয়া। আদালত বিতর্কিত জমির দুই ভাগ হিন্দুদের এবং এক ভাগ মুসলিম সুন্নি ওয়াকফ্ বোর্ডকে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, রাম জন্মভূমির উপর রামলালার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এটাই বড় প্রাপ্তি। এরপর সেখানে একটি নজর কাড়া সুন্দর স্থাপত্যের মন্দির প্রতিষ্ঠার বাধা থাকা উচিত নয়। তবে এই কাজটি সুন্দরভাবে করতে দেশের মুসলিম সমাজকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। সুন্নি ওয়াকফ্ বোর্ড এবং মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ডের সদস্যদের উচিত ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তি সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবে রামলালার মন্দির গড়তে আদালতের দেওয়া জমির অধিকার স্বেচ্ছায় হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়া। পরিবর্তে অযোধ্যার অন্যত্র মসজিদ নির্মাণে হিন্দুরাও সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করতে বাধা দেবে বিদেশী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এবং ছদ্ম-সেকুলারবাদী সাংবাদিকরা। তাই স্বার্থ-বুদ্ধি পরিচালিত সংবাদপত্র এবং তার সাংবাদিকদের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিতে মুসলিম সমাজকে সদাই সতর্ক থাকতে হবে। এ কথাও ভুললে চলবে না যে তিস্তা শীতলবাদের (ধর্মে মুসলমান) মতো বহু ছদ্মবেশী সমাজকর্মীরা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এরা চেষ্টা করবে ঘোলা জলে মাছ ধরার। তাই সাধু সাবধান।

দেগঙ্গা ব্লকে পুজো হচ্ছে না

(১ পাতার পর)

মুসলমানরা দাবী করেছে। পুলিশ হিন্দুদের পরোক্ষে ওই জমি ছেড়ে দিতে বলেছে। এতে হিন্দুরা বেশ অসন্তুষ্ট। সবাই ভোট দিয়েছিল তৃণমূলকে। কোনও তৃণমূল নেতা-নেত্রী কোনও ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সামান্যতম সান্ত্বনাও দিতে যাননি। ভাড়া করা লোক দিয়ে (যাদের বেশির ভাগই মুসলমান) শান্তিমিছিল করেছেন। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের গ্রেপ্তার দাবী করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রমতে, মুসলমান জেহাদিরা বারাসাত থেকে বসিরহাট পর্যন্ত এলাকাকে হিন্দুশূন্য করতে চায়। এলাকায় বাংলাদেশ থেকে হুজি জঙ্গিরা এসে গোপনে মিটিং করে, প্রচার চালিয়েছে। এসবই বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের গোপন নীল নক্সামাত্র।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে

(১ পাতার পর)

হুমায়ুন 'রাজনৈতিক' বলে উল্লেখ করেন। সংবাদমাধ্যম থেকে যা জানতে পেরেছি তাতে এই রায় বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না বলে ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মন্তব্য করে বলেন, 'এই রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পদক্ষেপ। এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে এই রায় সাহায্য করবে।'

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বি এন পি) সদস্য ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন বিষয়টি স্পর্শকাতর বলে উল্লেখ করে রায় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেও ওই দলের অপর সদস্য এম কে আনোয়ার বলেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মন রক্ষা করেছে আদালত। এটি একটি 'কম্প্রোমাইজড' রায়। তাঁর মতে 'আদালতের রায়ে সত্যের প্রতিফলন হয়। এখানে কোনও কম্প্রোমাইজের সুযোগ নেই।'

বাংলাদেশের জামায়েত-ই-ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারল অধ্যাপক মুজিবর রহমন বলেন, 'মুসলিমরা অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে ওই অধ্যাপক বলেন, যেখানে মসজিদে নামাজ হবে, তার পাশেই আবার মূর্তি পূজা-এটা কি করে সম্ভব। বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবরে সেদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সভাপতি মাহবুব হোসেনের মন্তব্য, 'এই রায়ে মুসলমান সমাজ কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হতে পারে। তবে আশা করা যায়, মুসলমানরা আদালতের রায় হিসাবে এটা মেনে নেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক হাইকোর্টের রায়কে যুগান্তকারী বলে উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন যে 'এই রায় ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মেনে নেবে। বহুধর্মের দেশ ভারতে সবাই যাতে নিজ ধর্ম পালন করতে পারে রায়ে তা নিশ্চিৎ করা হয়েছে। কোনও সভ্য সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা কাম্য নয় বলে উল্লেখ করে ওই উপাচার্য বলেন এর আগে অযোধ্যার বিষয় নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে আশা করছি এখন তা হবে না। ইতিহাসের অধ্যাপক ও সাংবাদিক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন হাইকোর্টের রায়কে ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত বলে মন্তব্য করে বলেন, ইতিহাসের থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এই রায়ে।

মন্দির ছিল, আছে, থাকবে

(১ পাতার পর)

তথাকথিত 'বাবরি মসজিদ' শব্দ প্রয়োগও বেআইনী এবং আদালতের রায়ের বিরোধী হয়ে গেল।

লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের তিনজন বিচারপতির দু'জন যথাক্রমে— বিচারপতি শিবগাতউল্লা খাঁন এবং বিচারপতি সুধীর আগরওয়াল একবাক্যে সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ডের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। 'ইন্ প্রিলিমিনারি স্টেজ দি জজেস্ ডিসমিসড্ দি অ্যাপলিকেশন অফ্ সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ড'— একথাই একাধিক আইনজীবী বিচারকক্ষের বাইরে অস্থায়ী মিডিয়া সেন্টারে এসেও বলেছেন।

মহামান্য বিচারপতি ধরমবীর শর্মা তাঁর রায়ে বলেছেন— 'বিতর্কিত জমি সহ (২.৭৭ একর) সম্পূর্ণ অধিগৃহীত এলাকাই (৭০.০১৮২ একর) ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের। ওখানে অন্য কারও কোনও দাবী চলবে না।'

তাই ২.৭৭ একর জমির এক-তৃতীয়াংশ ওয়াকফ্ বোর্ডকে দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কীভাবে?

৯০ বছর বয়স্ক মুসলিম নেতা হাসিম আনসারিও আদালতের রায়কে মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। সেন্ট্রাল সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ড সুপ্রীম কোর্টে যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। রামজন্মভূমি পক্ষের সকলে জমি ওয়াকফ্ বোর্ডকে দেওয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

রামমন্দির নির্মাণে সকলে সামিল হোন

(১ পাতার পর)

শ্রীরাম এবং জন্মভূমি অযোধ্যার প্রতি ভারতীয় জনমানসের সনাতন আস্থার সসম্মান স্বীকৃতি প্রদত্ত হয়েছে। এজন্য আমি মাননীয় বিচারপতিদের, মামলায় সংশ্লিষ্ট তাবৎ আইনজীবীদের, শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনে নেতৃত্বপ্রদানকারী সকল পূজ্য সাধুসন্তবৃন্দ এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও সহায়ক জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই আস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনে কোঠারী বন্ধুদের মতো যে সকল করসেবকরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের পবিত্র ও তেজস্বী স্মৃতিতে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

মন্দির নির্মাণ এদেশের জাতীয় পরিচয় স্বাভিমান, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, তথা বিজয় গরিমার দ্যোতক। আমাদের এই ভারতবর্ষের সনাতন, একাত্মবোধক, সকলের প্রতি আত্মীয়ভাব, সহিষ্ণু সংস্কৃতি এবং আদর্শ আচরণের মর্যাদার প্রতীক এবং দ্যোতক হলেন শ্রীরাম। মন্দির নির্মাণ আন্দোলন কোনও গোষ্ঠী বা বর্গের বিরোধিতা বা প্রতিক্রিয়াত্মক নয়।

অতএব, শ্রীরামজন্মস্থানে ভব্য শ্রীরামমন্দির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পথ প্রশস্ত করার সহায়ক আদালতের এই রায়কে কোনও গোষ্ঠী অথবা বর্গবিশেষের জয় বা পরাজয় হিসেবে দেখা উচিৎ নয়। জয়ের আনন্দ সংযম, শান্তিপূর্ণ, আইন ও সাংবিধানিক সীমার মধ্যেই হোক, অকারণ উত্তেজনা যাতে না ছড়ায় এমন সুবিবেচনার সঙ্গে ব্যক্ত হোক। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে সহিষ্ণুতা এবং সকলকে একাত্ম করার মনোভাব বিদ্যমান। এটা মনে রাখতে হবে। পুরানো ঘটনা ভুলে গিয়ে এক সুন্দর ও পবিত্র লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ, অনেক ভাষা ও বিবিধ উপাসনা পদ্ধতিকে সুশোভিত করছে আমাদের সমাজ। সেই সমাজকে ভেদাভেদ ভুলে একাত্মতার সূত্রে আবদ্ধ করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসুন, মুসলমান সহ আমাদের সমাজের সকল বর্গকে আমাদের আন্তরিক এবং আত্মীয়তাপূর্ণ আহ্বান, বিগত দশকের বাদ-বিবাদ ও তিক্ততা এবং অবিশ্বাস ভুলে আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে শ্রীরামজন্মস্থানে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের সুরম্য মন্দির নির্মাণের সাংবিধানিক এবং ব্যবহারিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সকলে মিলে অভিযানে সহায়ক হই।"

শোক সংবাদ

পরলোকে দুলাল ধর

গত ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার জেলা সঙ্ঘচালক দুলাল রঞ্জন ধর ৭২ বছর

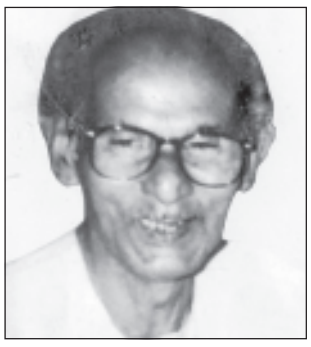

বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। কোচবিহারে সঙ্ঘের কাজ শুরুর সময় থেকেই তিনি স্বয়ংসেবক এবং আমৃত্যু সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫০ সালে সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (অধুনা প্রয়াত এবং 'স্বস্তিকা'র প্রাক্তন সম্পাদক) যখন জেলা প্রচারক তখন তিনি সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন।

তিনি একসময় জলপাইগুলি বিভাগ কার্যবাহ এবং পরবর্তী সময়ে বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে সারা উত্তরবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা শোকাহত। কিছুদিন আগেই তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছিল। তিনি অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক, আত্মীয়-স্বজন এবং দুই পুত্র, এক কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অরুণ কুমার প্রামাণিক। তিনি ছিলেন আবাল্য স্বয়ংসেবক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর স্ত্রী সহ দুই পুত্র বর্তমান।

* * *

চলে গেলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি-র হাসনাবাদের সেবিকা ঋতা চৌধুরী। গত ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে তিনি কাঁচরাপাড়ার একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দুই পুত্রও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর।

* * *

দার্জিলিং জেলার মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ পিন্টু অগ্রবালের মাতৃদেবী বিদ্যাদেবী অগ্রবাল গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি বেশ কিছুদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মাধবভবনে দীর্ঘদিনের দাতব্য হোমিও চিকিৎসক ও স্বয়ংসেবক ডাঃ সীতানাথ রায়ের মা গত ২৪ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

* * *

মথাভাঙার স্বয়ংসেবক পুলক সরকারের মাতৃদেবী গত ২১ সেপ্টেম্বর ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর ৭ ছেলে ও ২ মেয়ে বর্তমন।

মঙ্গল নিধি

শিলিগুড়ি নগরের স্বয়ংসেবক ও এ বি ভি পি-র নগর সভাপতি ও পেশায় শিক্ষক দীপঙ্কর মিত্র তাঁর বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গল নিধি স্বরূপ ১০০০ টাকা দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগ প্রচারক জয়রাম মণ্ডল।

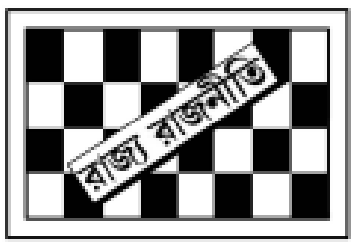

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমের মরণকালে হরিনাম

নিশাকর সোম

রাহুল গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে যুব কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করার জন্য সফর করে গেলেন। এই সফরকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের মধ্যে যথেষ্ট চঞ্চলতা দেখা গেছে। তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা একান্তই প্রণিধানযোগ্য। মমতাদেবী বলেছেন, “বসন্তের কোকিল কুহু ডাক দিতে এসেছেন, সোনার সিংহাসনে বসে রাজনীতি করছেন।” এইসব বলে বস্তুত তিনি সোনিয়া গান্ধীকে ইঙ্গিত করেছেন।

মমতার জবাবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মানস ভুঁইয়া বলেছেন, রাহুল গান্ধীর যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের নিজেদের অবস্থান দেখুন। মমতার কথার তীব্র সমালোচনা করেছেন সারা ভারত যুব কংগ্রেসের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য রাহুল যথার্থই বলেছেন যে সম্মানের ঐক্য চাই। যদি তা না পাওয়া যায় তো কংগ্রেস একাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা কেশব রাও বলেছিলেন, তিনি মমতার ওই বক্তৃতা শোনেননি। কেশব রাও এ নিয়ে আরও যে কথাটি বলেছেন তা হলো— সিপিএম তরোয়াল নিয়ে এলে— ওই তরোয়াল দিয়ে তাদের মাথা কাটতে হবে।

পাঠক হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন এইসব জ্ঞাত কথা দিয়ে কেন গৌরচন্দ্রিকা? এর কারণ হলো— আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোট থাকবে— এই জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া অসম্ভব নয়। ফলে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। তখন কিন্তু আবার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের একটা বিশাল সিপিএম-বিরোধী অংশ সিপিএম-এর পরিবর্তে এক সুস্থ-ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রিসভা দেখ্‌তে চান।

কেশব রাও তলোয়ার দিয়ে সিপিএম-এর মাথা কাটার কথা বলেছেন। এ-কথা ঠিকই যে সিপিএম বিগত তিনদশক ধরে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে এবং এখনও সিপিএম-নেতা দীপক সরকার ও মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ সন্ত্রাসের ছক কষছেন এবং ‘এলাকা মুক্ত’ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। এই দুই পক্ষের বক্তব্য ধীরে ধীরে রাজ্যকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে না কি?

এর ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে শান্তি ঘোষণার জন্য হয়তো সিপিএম-কে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তখন তারা শুরু করবে পাল্টা লড়াই। এখন থেকেই তার গোপন প্রস্তুতি ‘ক্ল্যানডেস্টাইন’(স্তুপ্তস্তন্দ্বব্দ্ধন্দ্ব)-এর কাজ চলছে। এর ফলে রাজ্যের মানুষের উন্নতির প্রগতির শান্তির আশা কি পূরণ হবে?

বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই সিপিএম-মাসলম্যানদের এক বিরাট অংশ তৃণমূলে আশ্রয় নিয়ে নেবে এবং ইতিমধ্যেই তাদের একাংশ তৃণমূল-এ প্রবেশ করেছে।

সিপিএম পরিচালিত বিদায়ী বামফ্রন্ট সরকার একের পর “জন-দরদী” প্রকল্প ঘোষণা করছে। এইসব দেখে বলতে ইচ্ছে হয়, সকালবেলা গেল হেলায় ফেলায়— সন্ধ্যাকালে বাতি জ্বালায়। তিন দশক ধরে গজদন্ত মিনারে বসে থেকে চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় করে সিপিএম সময় কাটিয়েছে। আর নিচের তলার কর্মীরা জনগণকে খালি হুমকি দিয়েছিল—“দানা ভরে দোব— চুপ করে থাক্।”

এ সম্পর্কে মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষক সমাবেশে বলেছেন, “তিরিশ বছর খেয়ে খেয়ে পার্টিকর্মীদের তেল হয়েছে।” তিনি বারংবার বলেছেন, সাদাচুলের লোকেদের সরাও আর কালো চুলের গরীব ছেলেদের পার্টিতে আনো— নেতা কর। তিনি এও বলেছেন, জনগণের দেওয়ায় ট্যাক্সের টাকায় আমরা লপচপানি মারছি, এ-টাকা বুদ্ধবাবুর বাবার বা আমার নানির নয়।

ভাবতে পারেন এবারের ফিল্ম উৎসবে আমন্ত্রিতদের তালিকা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজে তৈরি করেছিলেন! শোনা যায় বহু বামপন্থী সিনেমা কর্মী, অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালক যাঁরা বুদ্ধবাবুর অপছন্দের; তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এসব দেখেশুনেই মন্ত্রী রেজ্জাক বলেছেন, “আমাদের তেল হয়েছে।”

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসু উত্তরবঙ্গে এক সভায় বলেছেন, “সরকারের বেশ কিছু ভুল কাজ, ভুল সিদ্ধান্ত ও নেতা-নেত্রীদের আচরণে জনগণ আমাদের কাছ থেকে সরে গেছেন।” বড় দেরিতে বুঝলেন বিমানবাবু। রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে তো তিনি তিন দশক ধরে আছেন। কি করেছিলেন এত দিন? এসব দেখে বলতে ইচ্ছে করে, “মরিয়া সিপিএম প্রমাণ করিল মরিয়াছি”। বারবার লেখা হয়েছে, মাছের মাথা থেকেই পচন ধরে। মস্তকে হৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?

ভাবতে পারেন এবারের ফিল্ম উৎসবে আমন্ত্রিতদের তালিকা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজে তৈরি করেছিলেন! শোনা যায় বহু বামপন্থী সিনেমা কর্মী, অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালক যাঁরা বুদ্ধবাবুর অপছন্দের;তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এসব দেখেশুনেই মন্ত্রী রেজ্জাক বলেছেন, “আমাদের তেল হয়েছে।”

সিপিএম তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোং সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলছেন। হঠাৎ করে তিন দশক পরে মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে বুদ্ধদেববাবু পুরস্কার দিলেন। মমতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই কাজ করতে গিয়েও বুদ্ধদেববাবুকে মতুয়া সঙ্ঘের বড়মার কনিষ্ঠপুত্র মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন, “আমাদের যা করবার সবই মমতা করে দিয়েছেন।” তিনি আরও বলেছেন, মরণকালে হরিনাম করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সম্প্রদায়ের ভোট পাবার জন্য যে যে নেতা তাঁদের খুশি করার চেষ্টা করছেন, সেটাও একরকমের সাম্প্রদায়িকতার নজির নয় কি?

বুদ্ধবাবুরা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ‘বহুল ব্যবস্থা’ ‘বহু সুবিধা’ ঘোষণা করে চলেছেন। এটা মুসলিম সম্প্রদায়ের পিঠ চুলকানো ছাড়া কিছুই নয়? এটাও মমতার পদাঙ্ক অনুসরণে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলা। সম্প্রতি দেখা গেলো মুসলিম সম্প্রদায়ের এক ধর্মগুরুর এন্তেকাল-এর পর বুদ্ধবাবুর পক্ষ থেকে এক মন্ত্রী গেলেন এবং মালা দিলেন। ভালো কথা। অথচ এই বুদ্ধবাবুই বাংলার ব্যাঘ্র-তনয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীর সভায় উপস্থিত থাকতে অস্বীকার করেছিলেন। ‘ভোট বড়ই বিষম বস্তু। তাহা পাইবার জন্য ক্ষমতালোভীরা সবপ্রকার অকাজ-কুকাজ করিতেও দ্বিধা করে না’। একটি কথা উল্লেখ্য। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হরিশ খারে বলেছেন, “স্বজনপোষণ এবং যেন-তেন প্রকারেণ ভোটে জেতা ছাড়া কংগ্রেস আর কিছুই বিশ্বাস করে না।” অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য তৃণমূলনেত্রীকে যে কোনও কনসেশন দিতে তাঁরা প্রস্তুত। এর পরিণতিতে আগামী ডিসেম্বর মাসে এ-রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা তৃণমূল নেতারা বলছেন।

এদিকে সিপিএম-এর নেতারা— অর্থাৎ দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ পুনর্দখল অভিযানে নেমেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও প্রাথমিক শিক্ষকদের সভাতে এই ‘ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান’ জানিয়েছেন। তবে বুদ্ধবাবু যখন যা বলেন তার ফলে তাদের পার্টির লাভের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি।

পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ-সম্পাদক-এর ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ঘটনা— কলকাতা পুলিশের সদরদপ্তরে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু, পুলিশের মধ্যে রাজনীতি আনার ফল সিপিএমই ভোগ করবে— রাজ্য সিংহাসনে রাজা পাল্টানোর সময় কালেই তা প্রকট হবে। যেমন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বর্তমানে তৃণমূল নেতা রচপাল সিং। শোনা যাচ্ছে তিনিই মমতার মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে পুলিশমন্ত্রী হবেন।

সেই প্রাক্তন পুলিশ-কর্তা রচপাল সিং সিপিএম-এর সদর দপ্তরের কোষাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুশীল চৌধুরীর রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য করে সিপিএম-কে বিড়ম্বনায় ফেলেছেন।

এদিকে দুই যুযুধান গোষ্ঠী দখল-পুনর্দখলের নামে সশস্ত্র অভিযানে যাচ্ছে— নিরীহ মানুষ হবেন উলুখাগড়া। ‘বলং বলং বাহুবলং’ নীতির উৎকট উলঙ্গ উল্লাস, এই সর্বনাশ কে রোধিবে?

অন্য রকম

নরসআম্মাজী-কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বেঁচে থাকতে শুধুই একবেলা খাবার খান তিনি। মেনু ভাত আর সাম্বার, ব্যস এইটুকুই! কারণ এই খাবারের জোরেই জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রীতিমত ‘মিরাকেল’ ঘটিয়ে ফেলেছেন ব্যাঙ্গালোরের নরস আম্মা। ৯২ বছরের এই বৃদ্ধা একবেলার খাবারকে সম্বল করলেও যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন জলের সাথে। দীর্ঘ প্রায় ৭৮ বছর ধরে জলের একটি ফোঁটাও মুখে ফেলেননি তিনি। কিন্তু কেন জলের সঙ্গে তার এই বিরোধ? বৃদ্ধার কথায় “জীবনে তিনটে জিনিসকে ভয় পাই আমি— ভগবান, ডাক্তার ও জল। জলের প্রতি আমার আতঙ্কের সূত্রপাত ১৯৩২ সালের গোড়ায়। সেইসময় আমি একবার এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। অসুস্থ হওয়ায় আমার গলা শুকিয়ে যেতে লাগল। সেইসময় জলের এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি প্রচুর পরিমাণে জল খেয়েছিলাম। কখনও কখনও দিনে ১০ লিটার পর্যন্ত জল আমি খেয়েছিলাম।

এইভাবে প্রায় দুমাস চলল। এর ফলও হলো। ভয়াবহ, অতিরিক্ত জল খাওয়ার দরুণ আমার শরীর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর আমি আমার নিয়ন্ত্রণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার কোনও বাঁচার আশা ছিল না। পরবর্তীকালে, একজন আয়ুর্বেদ ডাক্তারের পরামর্শ মতো আমাকে স্টীম থেরাপি (steam therapy) পদ্ধতির দ্বারা চিকিৎসা করা হয় এবং আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ওই একই রোগের কারণে শয্যাশায়ী হতে হয় আমাকে। তখন থেকে জলের প্রতি এক অজানা আতঙ্ক জন্মে গেছিল আমার।’

বাইরের লোকের কাছেনরস আম্মা হলেও প্রিয়জনদের চোখে তিনি নরসআম্মাজী। কিন্তু

নরসআম্মাজী

কেমন করে কাটান নরসআম্মাজী তার জীবনের প্রত্যেকটি দিন? তিনি বলেন “মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে একজন স্কুল শিক্ষকের সাথে বিয়ে হয় আমার। তখন থেকেই সংসারের গন্ডির মধ্যে আমার প্রবেশ ঘটল। প্রত্যেকদিন সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠি। নিজের কাপড় কেচে, রান্না করে পাঁচ ঘণ্টা ভগবানের প্রার্থনা করি। সারাদিন আমার আহার বলতে শুকনো ফল আর বাদাম।” বর্তমানে নরসআম্মাজীর সংসারে আছেন তিন ছেলে, তিন মেয়ে, ১৬ জন নাতি এবং ২১ জন প্রপৌত্র। তার ৭৭ বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুব্বারামাইয়ার কথায় ‘আমিই মায়ের প্রথম সন্তান। জন্মের পর আমি তাকে কখনও জল খেতে দেখিনি। এমনকী আমার সঙ্গে বারাণসীতে গরমকালে গিয়েও তিনি একবারও জল খেতে চাননি।”

সংসার ও প্রিয়জনদের প্রতি কর্তব্য করতে করতে তিনি কিন্তু কখনও জীবন থেকে মুছে ফেলেননি তার প্রথম প্রেম— তীর্থভ্রমণকে। ভারতের বিভিন্ন জায়গা সহ তিনবার কাশী ও তিনবার হিমালয় ঘুরে এসেছেন তিনি। ২০০০ সালে ৩৬ দিনের ভারত ভ্রমণও সেরে ফেলেছেন তিনি। তবে এবার ভারত নয়, ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চান নাতির কাছে সিঙ্গাপুরে।

বয়স ৯২, কিন্তু উদ্দীপনায় তিনি যেন ২৯ বছরের যুবতী। ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে দূর করা যায় শারীরিক প্রতিকূলতাকে আজকের যুব সমাজকে এটাই তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাইতো আজও তিনি ছুটছেন নতুন দেশের সন্ধানে। নতুন দেশের খোঁজে। আজও তিনি সকলের প্রিয় নরসআম্মাজী।

ত্রিপুরার কৈলাশহরে বি এস এফের নাকের ডগাতেই অনুপ্রবেশ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ত্রিপুরার অন্যতম শহর কৈলাশহরে কমবয়েসী বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরা লাগোয়া সীমান্ত দিয়ে নিত্য-নিয়মিত যাতায়াত করছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এদের সংখ্যাটা ৩০/৩৫ এর বেশি। স্থানীয় মানুষের সন্দেহ এরা সবাই বাংলাদেশ থেকে পারে বাংলাদেশের ভারত বিরোধী জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা। ওদের হাত দিয়ে এপারে বিস্ফোরক পাচারের সমূহ সম্ভাবনা।

জানা গেছে, বি এস এফ-এর ঢিলে পাহারার ফাঁক গলে ওরা ভারতীয় এলাকায় ঢুকছে। অনেক সময় অল্পবয়সী বলে কোনওরকম সার্চ ছাড়া তারা ঢুকে পড়ছে,

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী (ফাইল চিত্র)।

ভারতে জাল নোট পাচারের কাজে যুক্ত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে শুরু করে বড় বড় শহরে পাক-মেড হুবহু নকল জালনোট আসছে। তবে ওইসব কিশোর-কিশোরীরা এপার থেকে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সস্তার নেশার দ্রব্য বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবাসীদের সন্দেহ এইসব ছেলে-মেয়েদের যে কোনও সময় কাজে লাগাতে ফিরে যাচ্ছে। তবে এরকম ঘটনা নতুন নয়।

কৈলাশহর সীমান্তের অধিকাংশ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ হলেও শহর এলাকার শ্মশান ঘাট থেকে শীলপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার বেড়া দিতে পারেনি ভারত সরকার। কারণ, বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি ডি আর-এর বাধাদান। ওই খোলা অংশ দিয়েই অনুপ্রবেশ হচ্ছে। বি এস এফ সব দেখেও চুপ থাকে। অতীতে ত্রিপুরার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বি ডি আর গুলিতে একজন বি এস এফ অফিসার মারা গিয়েছিলেন। এসময়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, প্রকাশ্য দিনের আলোয় প্রতিদিন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এরা ঢুকে পড়ছে। অথচ ওই এলাকায় বি এস এফ সবসময় পাহারা দিচ্ছে। তাদের হাতে রয়েছে অত্যাধুনিক দূরবীণ থেকে নাইট-ভিশন ডিভাইস। কারও কারও মতে কিশোর-কিশোরীদের নিরীহ মনে করে বি এস এফ ছেড়ে দিচ্ছে। পানিচৌকি বাজার এবং মাছ-মাংস বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ওই বাংলাদেশী বালক-বালিকাদের দিয়ে অল্প পয়সায় কাজ করাচ্ছেন কিছু ব্যবসায়ী। অনেকে সময়ে কোল্ডস্টোর থেকে বাজারে আসা আলু- পেঁয়াজের বস্তা থেকে বেছে পচা, আধপচা বের করে দেয়। বিনিময়ে বিনাপয়সায় ওইসব আধপাকা বা নিম্নমানের আলু-পেঁয়াজ ওরাই নিয়ে যায়। একাজ ছাড়াও দোকানে অন্যান্য কাজও করে থাকে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে অনেকেই এসে এপারের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। অনেকে ব্রয়লার-এর দোকানে মুরগী কাটা ও দেওয়ার কাজ করে।

সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক হলো এরা নিজেদের পোষাকের ভেতরের গোপন পকেটের সাহায্যে জাল নোট আনা নেওয়া করছে। পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই খুব সহজেই এদের দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বাড়ি জামাত ডেরা

সংবাদদাতা।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামাত সমর্থিত সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ আমিনুর রহমান মজুমদারের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় (জামাত-শিবিরের) জঙ্গি আস্তানার সন্ধান মিলেছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভোররাতে পুলিশ বাড়িটিতে তল্লাসী চালিয়ে বেশ কিছু খেলনা রাইফেল, খেলনা পিস্তল, ব্যাটারি, ব্যানার, পতাকা, ২শ'টির মতো জেহাদি বই, সিডি, স্টিকার ও পোস্টার উদ্ধার করেছে। বাড়ি দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত দু'জনকে পুলিশ আটক করলেও ওইদিন রাত ৮টা পর্যন্ত কোনও মামলা দায়ের হয়নি। সংশ্লিষ্ট অধ্যাপককে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার শরীফুর রহমান দৈনিক ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, বাড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতপন্থী শিক্ষকের। বাসাটি জামাত-শিবিরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল।

রমনা জোনের এ ডি সি নুরুল ইসলাম বলেন— বাসায় কেন জেহাদি বই, খেলনা পিস্তল, পুলিশের পোশাক পাওয়া গেছে তা যাচাই-বাছাই চলছে। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট অধ্যাপককেও

জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তবে জঙ্গি আস্তানার বিষয়ে অধ্যাপক ডঃ আমিনুর রহমান মজুমদার দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, বাসায় জঙ্গি আস্তানার প্রশ্নই আসে না। প্রায় ৩ মাস যাবৎ বাসাটি বন্ধ ছিল। গতকাল আওয়ামী-যুব লীগের পরিচয়দানকারীরা বাসার ভিতরে ঢুকে আগে থেকে অবস্থান নেয়। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে তারা এসে বাসা তল্লাশী করে। বাসা থেকে যেসব বইসহ অন্যান্য জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে উল্লেখ করেন।

বাসার পাশের একাধিক বাসিন্দা সাংবাদিকদের বলেন, এ বাসায় যারা থাকতো তাদের অধিকাংশই জামাত-শিবিরের লোক। তারা বাসাটিকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতো। এখানে প্রায়ই শিশুদের বিভিন্ন বই ও কিশোরকণ্ঠ পত্রিকা পড়ানো হতো। এখানে জামাতের বছরে তিনটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বলে তারা জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ কে এম সাইফুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হনুমান হত্যায় উত্তাল কালিয়াচক

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। রামভক্ত হনুমান-কে নৃশংসভাবে হত্যা করায় উত্তাল হয়ে উঠল মালদা জেলার কালিয়াচক তিন নং ব্লকের গোলাপগঞ্জ অঞ্চলের নলদহরী, বাখরাবাদ, সার দেওয়া, পাগলা টোলা গ্রাম। গত ৬ সেপ্টেম্বর পাগলা টোলা গ্রামে একটি হনুমানকে হাঁসুয়া দিয়ে জাহিরুদ্দিন শেখ (২৮) নামে একটি যুবক কেটে ফেললে পার্শ্ববর্তী হিন্দু জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে পথ অবরোধ করে। ঘটনায় জানা যায় এই

গ্রামে বেশ কয়েকদিন আগে কোথা থেকে একটি হনুমান এসে হাজির হয়। মুসলিম অধ্যুষিত এই গ্রামের লোকেরা খাবার দিতে থাকলে হনুমানটি সেখানে থেকে যায়। ঘটনার দিন জাহিরুল শেখ মুড়ির লোভ দেখিয়ে হনুমানটিকে ডেকে আনে এবং হাসুয়া দিয়ে প্রথমে পায়ে কোপ মারলে হনুমানটি হাত জোড় করে। কিন্তু নির্দয় যুবকটি এর পর পেটে কোপ মারে। এই খবর চাউর হতেই প্রায় ১০-১৫ হাজার হিন্দু জড়ো হয়ে দোষী যুবকটিকে গ্রেপ্তারের দাবী জানতে থাকে। মালদা শহর থেকে বিশাল পুলিশ, বি.এস. এফ এবং র‍্যাফ আসে। হিন্দুদের দাবী মতো দোষী জাহিরুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষে হনুমানটিকে পোষ্টমর্টেম করে গোলাপগঞ্জ শ্মশানে সমাধি দেওয়া হয়। এদিকে ১৩ সেপ্টেম্বর গোলাপগঞ্জের ৫-৬টি গ্রামের লোকেরা হনুমানের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করে।

বিজেপি কাউন্সিলারকে হত্যার চেষ্টা

সংবাদদাতা।। মালদা শহরের ১১নং ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার সঞ্জয় দের বাড়িতে ঈদের দিন সন্ধ্যায় দীর্ঘ সময় লোডশেডিং থাকার সুযোগ নিয়ে হামলা চালায় কিছু মুসলিম দুষ্কৃতী। মদ্যপ অবস্থায় ১০-১৫ জন যুবক সঞ্জয় দে-কে মারতে আসলে তার স্ত্রী তাকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রীলের বাইরে থেকে কয়েকজন তার চুল ধরে প্রচণ্ড টান দেয় এবং কিছু চুল উপরে নেয়। অজ্ঞান হয়ে গেলে সঞ্জয় দে-র স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় শহরে উত্তেজনা ছড়ায়। রক্ষাটুলীর এইসব দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবীতে ১৩ সেপ্টেম্বর মহিলাদের এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে থানায় ডেপুটেশন দেয়। পুলিশ এখনও দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। থানাতে এফ. আই. আর. করা সত্ত্বেও দোষীরা এখনও কেন গ্রেপ্তার হয়নি তার জবাব চেয়েছেন ১১ নং ওয়ার্ডের অধিবাসীরা।

মালদার গ্রামে ধর্মান্তরকরণ

সংবাদদাতা।। গত ১০ সেপ্টেম্বর মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার মহারাজপুর কাঞ্চনতার থেকে সনুপ্রসাদ নামে এক অজ্ঞাত পরিচয় বালককে মালু শেখ-এর বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। জানা গেছে ১০-১৫ দিন আগে ৬-৭ বছরের এই বালকটিকে মালু শেখ বিহারের কোনও স্থান থেকে চুরি করে আনে। এই খবর সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা জানতে পারলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ইংলিশবাজার থানা কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এক সাথে এসে ছেলেটিকে উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীরা বাধা দেয়। তারা বলে এই ছেলেটি তাদের। স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় ছেলেটিকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। ছেলেটিকে পুলিশ গাড়িতে তুলবার সময় মুসলিম মহিলাদের বলতে শোনা যায় একজনকে এবার না হয় আমাদের জাতে তুলতে পারলাম না, কিন্তু আরও দুজন হিন্দুকে আমরা ধর্মান্তরিত করেছি। তারা এখানেই আছে।

উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় বীভৎস তাণ্ডব দেখে এলাম

দেবজ্যোতি রায়

বিচারপতি গোপালদাস খোসলা তাঁর 'স্টার্ণ রেকনিং' শীর্ষক গ্রন্থে ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের প্রচারিত একটি প্রচারপত্রের উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, "মুসলমানদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, এমন এক রমজান মাসেই কোরান নাযেল হয়েছিল। এমন এক রমজান মাসেই খোদা 'জেহাদ' করার অনুমতি দেন। এমন এক রমজান মাসেই বদরের যুদ্ধ হয়েছিল। এটিই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান নিয়ে মহানবী জয়লাভ করেছিলেন। আবার এমন এক রমজান মাসেই পবিত্র মহানবী ১০,০০০ মুসলমান নিয়ে মক্কা জয় করে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। স্থাপন করেছিলেন মুসলিম কমনওয়েলথ। মুসলিম লীগের সৌভাগ্য যে, এমন একটি পবিত্র মাসেই তারা সংগ্রাম শুরু করেছে।"

এ বছর (২০১০) পবিত্র রমজান মাসের ২৬ থেকে ২৮ (৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত তিন দিন ধরে উত্তর ২৪ পরগণা জিলা শহর বারাসাত থেকে পূর্বদিকে দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত দেগঙ্গা বাজার, কার্তিকপুর বাজার ও কর্মকারপাড়া, বিশ্বনাথপুর, চ্যাংদোনা, আমিনপুর, খেজুরিডাঙ্গা এবং বেলিয়াঘাটা বাজার সংলগ্ন ঢালি পাড়া সহ বিরাট এলাকায় হিন্দুদের উপর এক তরফা পাশবিক অত্যাচার ঘটে গেল। তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দু। চট্টলপল্লীর প্রায় সকলেই এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে। ওই পাড়ায় গত ৪০ বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। বাস রাস্তা দিয়ে এই পাড়ায় যেতে হলে প্রায় পৌনে তিন একর পরিমিত একটি প্লট পেরোলেই পুজো মন্দিরটি চোখে পড়ে। এই প্লটটির বাঁ-দিকের আধাআধি অংশে মুসলিমরা কবরখানা বানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য অনুসারে ওয়াক্ফ বোর্ড নাকি তাদের এই অনুমতি দিয়েছে। আসলে এই প্লটটি একসময় রাণী রাসমণির মালিকানাধীন ছিল। সরকার এটিকে অনেকদিন আগে খাস করে নিয়েছে। প্লটটির ডানদিকের অংশে ৬০ ফিট চওড়া একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়ে চট্টলপল্লীবাসীরা যাতায়াত করেন এবং পুজোর সময় হাজার হাজার মানুষ পুজো দেখতে আসেন।

চট্টলপল্লীবাসীদের দাবি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তারা বিতর্কিত প্লটটির যে অংশে রাস্তা আছে, তা বহাল রাখতে চান এবং এই প্লটটির বাইরে তাদের পাড়ায় নির্বিবাদে পুজো করতে চান। কিন্তু ওখানকার মুসলমানরা তা চান না। গত ১৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর আমরা বেলিয়াঘাটা থেকে দেগঙ্গা বাজার পর্যন্ত আক্রান্ত এলাকাগুলো দেখতে যাই। চট্টলপল্লীতে গিয়ে জানতে পারি, স্থানীয় প্রায় সকল মুসলমানের ইচ্ছে বিতর্কিত প্লটটির চারদিকে দেওয়াল তুলে ঘিরে দিয়ে চট্টলপল্লীবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এর ফলে পুতুল পুজোর মতো ক্ষমাহীন পাপের কাজ বন্ধ করে দেওয়া যাবে এবং বাঙালি হিন্দুদের বাস্তুচ্যুত করা যাবে। গত ৬ সেপ্টেম্বর (২৬ রমযান) সকালের দিকে প্রায় ১ হাজার মুসলমান ওখানে এসে পাকা রাস্তা এবং বিতর্কিত প্লটটির সীমারেখায় দেওয়াল তৈরির জন্য ভিত কাটা শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে ভিত কাটা হয়ে যায়। হিন্দুরা এই কাজে বাধা দিলে মুসলমানরা অশ্লীল ভাষায় গালাগাল শুরু করে এবং অমল কর নামে এক ব্যক্তিকে প্রচণ্ড মারধোর করে। হঠাৎ বসিরহাটের সাংসদ (তৃণমূল কংগ্রেস) হাজী নুরুল ইসলাম এসে উপস্থিত হন। সঙ্গে নিয়ে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী রত্না রায়চৌধুরীকে। উভয়পক্ষ তাদের কাছে অভিযোগ জানালে হাজী সাহেব মিটমাট করার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে দেগঙ্গা থানায় গিয়ে রুদ্ধ দ্বার কক্ষে দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা বলে চলে যান ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত জামে মসজিদে। সেখানে ইমাম সাহেব এবং তার সহযোগীদের সঙ্গে কথা বলে মসজিদের ছাদে স্থায়ীভাবে মাইক বসিয়ে দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন গত নির্বাচনের আগে হাজী সাহেব কথা দিয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি বিতর্কিত জমিটি মুসলমানদের হাতে তুলে দেবেন এবং ওই জামে মসজিদে স্থায়ীভাবে মাইক বসিয়ে দেবেন। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিতর্কিত জমিটি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে এবং আলোচ্য মসজিদে স্থায়ীভাবে মাইক না বসানোর নির্দেশ আছে কোর্টের।

মুসলিম আক্রমণে দগ্ধ বিধ্বস্ত হিন্দুবাড়ী।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে হাজী সাহেব কোথায় গিয়েছিলেন তা এখনও রহস্যময়। বিরাট সংখ্যক মানুষের অভিযোগ, তিনি রত্নাদেবীকে নিয়ে রাত ৯-টা পর্যন্ত থানার ভেতরে ছিলেন। বিকেলে ইফতার শেষ হতে না হতেই প্রায় ২ হাজার মুসলিম গুণ্ডা বোমা, পিস্তল, ভোজালি, পেট্রোল এবং অ্যাসিড বাল্‌ব নিয়ে দেগঙ্গা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় একযোগে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। এখানে হিন্দুদের রাজনৈতিক রং কোনো কাজে আসেনি। সিপিএম সমর্থক কাপুরিয়াদের মিষ্টির দোকান যেমন আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি অক্রান্ত হয়েছে টি এম সি'র জাঁদরেল সমর্থক কানাইলাল গুপ্তার দোকান এবং নিরপেক্ষ গোপাল মণ্ডলের দোকান। আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অজস্রবার থানায় ফোন করা হয়েছিল, কিন্তু ফোন ধরেননি কেউ।

আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেগঙ্গা বাজার, কার্তিকপুর বাজার, বিশ্বনাথপুর, খেজুরিডাঙ্গা গ্রাম এবং বেলিয়াঘাটায় দু'দিনে প্রায় ১০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এদের মধ্যে ছিলেন চট্টলপল্লীর খোকন চৌধুরী সহ ৫ জন, দেগঙ্গার উত্তম সাহা, গোপাল মণ্ডল, অরুণ সাধুখাঁ, কানাইলাল গুপ্তা, গোপাল কাপুরিয়া এবং তার বড় ছেলে, সজলকৃষ্ণ দাস, কাজল দাস এবং আরও অনেকে। কার্তিকপুর বাজারে আমরা কথা বলেছি বিমল ঘোষ ও সরোজিত দাস সহ মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে ১৫-২০ জনের সঙ্গে। বিমলবাবুর নিজের দোকান ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু তার ভাড়াটে একজন মুসলমানের দোকানপাটের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। মহিমা বস্ত্রালয়ের মালিক একজন মুসলমান। তার কণামাত্র ক্ষতি হয়নি। ৭ তারিখ সকালে ওখানে র‍্যাফ নামে। তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গুণ্ডারা রাস্তার উপরে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ৪টি গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এগুলোর কঙ্কাল রাখা আছে দেগঙ্গা থানার পাশে। এ ছাড়াও বেলিয়াঘাটা থেকে দেগঙ্গা পর্যন্ত অনেক বাস, লরী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কার্তিকপুরের প্রধান মন্দিরের কালীমূর্তিটি ভেঙ্গে সকলের সামনে মন্দিরের মধ্যে প্রস্রাব করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এখান থেকে ১ কিলোমিটার দূরে খেজুরিডাঙ্গায় ৬টি হিন্দু বাড়ি সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিকদের নাম— অভিলাষ ঘোষ, নেপাল ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বাদল ঘোষ, তাপস ঘোষ এবং হরেন্দ্রনাথ বক্সী। এই বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার। তখন বড় রাস্তা দিয়ে 'র‍্যাফ' এবং সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। সেদিন সকালবেলা স্থানীয় মকলুকুর রহমান আর সোরাব কিছুটা দূরে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে গুজব রটিয়ে দেয় যে, কার্তিকপুরের বাঙাল হিন্দুরা মুসলমানদের মাথা কেটে ফুটবল খেলছে। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মুসলিম 'নারায়ে তকদির-আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে খেজুরিডাঙ্গার হরেন বক্সীর বাড়ির সামনে এসে প্রথমে টহলরত পুলিশের একটি গাড়ি আক্রমণ করে। পুলিশদের গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে পেটাতে শুরু করে এবং গাড়িটিকে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে বক্সীবাড়ির ১০ জন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ১ কিমি দৌড়ে মুসলমান পাড়ায় আশ্রয় চায়। সেখানে আশ্রয় না পেয়ে পার্শ্ববর্তী দাসপাড়ার এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ততক্ষণে বক্সীবাড়ি এবং ঘোষবাড়ির ৬টি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুণ্ডারা ভুল করে বক্সী বাড়ির কাছে একজন মুসলমানের (আহাদ আলি) বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম আমাদের কাছে একথাই বলেছে। তাদের ঘরটি আক্ষরিক অর্থেই কুঁড়ে ঘর। এর সঙ্গে ই তার শ্বশুরের পাকা বাড়ি। এই বাড়িতে কিন্তু আগুন দেওয়া হয়নি। আহাদ আলির কুঁড়ে ঘরটিকে আগুন লাগাবার পেছনে নিশ্চিত ভাবে কোনো মতলব ছিল। এই ঘটনা ছাড়া দেগঙ্গা থেকে বেলিয়াঘাটা পর্যন্ত অন্য কোনো মুসলমানের এক পয়সারও ক্ষতি হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যে সব রাজনৈতিক দলের সমর্থক আছেন।

কার্তিকপুরের পরে বেলেঘাটা। ২৬ তারিখ ওখানে গিয়ে প্রথমেই আমরা এখানে নামি। এখানে বাচ্চু কর্মকারের বাড়ি এবং তার কাছাকাছি ঢালি পাড়ায় ১৪/১৫টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে লুটপাট চালানো হয়েছে। মারধোর করা হয়েছে। প্রতিটি পাকা বাড়ির গেট ভাঙ্গা হয়েছে বোমা চার্জ করে। যতটা জানা গেছে, টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বাচ্চু কর্মকারের। তিনি ওই এলাকার সবচেয়ে বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন ৭ তারিখ ভোরে টহলরত র‍্যাফকে ঢিল ছুঁড়তে গেলে র‍্যাফের গুলিতে সাহাবুদ্দিন নামে একজন মুসলিম যুবক মারা যায়। কিন্তু দুর্বৃত্তরা রটিয়ে দেয় যে, বাচ্চু কর্মকার তার লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক দিয়ে ওই যুবকটিকে গুলি করে মেরেছে। এই ভিত্তিহীন অপরাধের জন্য বাচ্চুবাবুর সোনার দোকান লুটপাট করা হয় এবং তার বাড়িটি সম্পূর্ণ ভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পড়ে আছে শুধু খাঁচাটি। বাচ্চুবাবু ভাগ্যজোরে ছেলে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। আজও তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা অতি কষ্টে ১৫ তারিখ তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, কোনওদিন আমাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল না। আজও নেই। আমাদের দোকান এবং ঘরবাড়ি লুট করার জন্যই এই প্রচার। ২৬ তারিখ গিয়ে তাদের কোনও খোঁজ পাইনি।

তারপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৭৫ বছর বয়স্ক বিশ্বনাথ ঘোষ। তার বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই তাকে ঘুষি মারে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার একটি দাঁত পড়ে যায়। অন্য আর একজন বিশ্বনাথবাবুর ছেলে জগদীশকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে। অন্যান্যরা মেয়েদের শরীর থেকে গহনা ছিনিয়ে নিয়ে মারতে শুরু করে। পেট্রোল ঢেলে প্রতিটি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের ক্ষতির পরিমাণ কম করেও ৫ লক্ষ টাকা।

১৫ তারিখ সময়ের অভাবে আমরা সব বাড়িতে যেতে পারিনি। তবে তপন ঘোষ এবং নারায়ণ ঘোষের বাড়িতে গিয়েছি। নারায়ণ ঘোষের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। গুণ্ডারা সকলেই স্থানীয়। এখানেই থাকেন অঞ্চল প্রধান সদস্য (তৃণমূল) তথা শিক্ষক তারাপদ ঘোষ। অনেকের অনুরোধে আমরা তার সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমতা আমতা করে হাজী নুরুল ইসলাম সাহেবকে সমর্থন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ইনি স্বীকার করলেন ওই ৩ দিনের ঘটনা হিন্দুদের উপর মুসলমানদের পরিকল্পিত অত্যাচার। আমরা প্রশ্ন রাখি, তৃণমূল সমর্থনকারী হিসেবে আপনি সি.পি.এম-কে দায়ী করবেন কী? উত্তরে তিনি বললেন, এই তিনদিন প্রশাসন প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল? এই নিরিখে আমি বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করছি। পরদিন ওখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতি কবিতা বৈদ্য টেলিফোনে জানান, তাদের বাড়ীর সকলের গায়ে দুষ্কৃতীরা কেরোসিন ঢেলে তাদের পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে হাত-পা ধরে কোনো রকমে ছাড়া পান।

২৬ তারিখ আমরা ঢালি পাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সব বাড়িতে গিয়েছি। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক সুকুমার মিত্র পরিবেশিত দু'টি খবর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়াই আমাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম খবরটিতে বলা হয়েছে, ঢালি পাড়ার হিন্দু মেয়ে-বউদের আশ্রয় দিয়েছে পার্শ্ববর্তী মুসলিম পাড়ার মুসলিম মহিলারা। খবরটি একেবারে অসত্য নয়। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক ওখানকার এক নেতার ভাই জানালেন, একটি নিষ্ঠুর পরিকল্পনার অংশ এটি। ঢালি পাড়ার বউ-বাচ্চাদের দূরে ডেকে নিয়ে ঘরগুলি খালি করে সহজে লুটপাট এবং পুড়িয়ে দেবার কাজ সহজ করার উদ্দেশ্যেই ওই নাটক করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় মুসলমানরা যে মোটেই হিন্দুবিদ্বেষী নয়, তা প্রমাণ করা। বেলিয়াঘাটার মুসলমানরা যে ৩ লক্ষ টাকা

(এরপর ১৪ পাতায়)

অসুর দমনে সুরের কুমারী

নবকুমার ভট্টাচার্য

তিনি কুলকামিনী, তিনি পরমভাগ্য দান করে থাকেন, সমস্ত সিদ্ধি তিনি দান করেন, নবযৌবন চাপল্যে তিনি ভরপুর, স্বর্ণলঙ্কারে ভূষিতা, এই বিশ্বের বাক্‌শক্তি স্বরূপা সেই পরমাসুন্দরী কুমারী দেবীকে প্রণাম করি। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে—'ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্য সন্দায়িনীং কুমাররতি চাতুরীং সকল সিদ্ধি মানন্দিনীম্' —ইত্যাদি। দেবীদুর্গা পূজিতা। হয়েছেন কুমারীরূপে। কেন? প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে 'কুমারী' নামে এই দেবী আদ্যাশক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে দুর্গা গায়ত্রী রয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে— ওঁ কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ ওঁ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাতা ওল্টালে দেখা যাবে দেবী কুমারী, কারণ দেবী সরল মনের। সংসারের প্যাঁচোয়া প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে নেই। তিনি উজ্জ্বল মেঘমুক্ত মনের অধিকারিণী। বিশ্বসংসারের মূল প্রকৃতি যে নারী সেটা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের ঘরগেরস্থালিতে চোখ বোলালেই এটা হাড়ে হাড়ে মালুম হবে। একজন মহিলা এই পুরুষ নিয়ন্ত্রা শক্তি নিয়েই এই জগতে আসে। পুরুষকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই সে জগৎ সংসারের স্টিয়ারিংটি নিজের মতো করে ঘোরাতে পারে। তাই কোনও একজন মহিলার কারণেই পুড়ে ছাই হয় সোনার লঙ্কা, হস্তিনাপুরের কুরুকুল। তাই এই নারী শক্তিকেই বিদ্যা অর্থাৎ শুভ আর অবিদ্যা অর্থাৎ অশুভ রূপে ভাগ করা হয়েছে।

এই নারী শক্তিকেই ভজনা করা হয়েছে যুগে যুগে। একালেও যেমন টাকা গয়না শাড়ি সর্বোপরি মিষ্টি কথায় নারীর মন মজানোর অহরহ চেষ্টা চলছে, পুরাকালেও তার অন্যথা হয়নি। কেননা মনুষ্যজাতি বোধহয় জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপেই শিখে গিয়েছিল যদি সুখে শান্তিতে থাকতে হয়, তাহলে নারীকে বিগড়ে দিলে চলবে না। কোনও পরিস্থিতিতে অনেক কায়দা কানুন করার পরও বিপদের হাত থেকে রেহাই না পেয়ে পুরুষ যেমন কাঁচুমাচু মুখে দ্বারস্থ হয় ঘরের কোনও মহিলার কাছে। অসুরদের তাড়া খেয়ে হাল বেহাল হয়েছিল স্বর্গের দেবতাদেরও। দেবীর কাছে গিয়ে বলেছেন? 'রক্ষ মাম্, ত্রাহি মাম্'। মধুর সম্ভাষণে তুষ্ট দেবী কাজের কাজটি করেছেন। অসুরদের বধ করেছেন।

দেবতাদের সম্মিলিত তেজপুঞ্জ হতে জন্ম হয়েছিল দেবীর। কিন্তু তিনি ছিলেন কুমারী। তাঁর অন্তর ছিল সুরছন্দে মাতোয়ারা। তাকে কিন্তু পরিণত যুবতী করে তোলা হয়নি। কেননা পরিণত মনের মধ্যে সংসারের জটিলতা ঢুকলেও ঢুকতে পারে। যদি সত্যিই ঢোকে তবে বিপদ। তিনি সহজে স্নেহ প্রেমে সাড়া দেন। তবু প্রচণ্ড বীরত্বের মধ্যেও কিন্তু দেবীর সুরসিঞ্চি ত কোমল মনটির হদিশ মেলে মহিষাসুর বধপর্বে। সেখানে নয় হাতে দেবী বিভিন্ন অস্ত্র ধরলেও কিন্তু একটি হাতে নিয়েছেন 'লীলা কমল'। সে আমলে কিশোরী মেয়েরা তো পদ্ম হাতে আনন্দে মেতে থাকতেন। অন্যদিকে সংসারের হিংসা, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা। কামুকতা। লোলুপতার বেশে যে আসুরিক প্রবৃত্তি, তাকে ধ্বংস করতে গেলে তো

সুকুমার শুভ্র চিত্তের একটি অপাপবিদ্ধ মন চাই। এই সৌম্যসুন্দর সৃষ্টির সামনে আপনা আপনিই নত হয়ে যায় আসুরিক দম্ভ। এক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। ত্রিশূল অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্নার যোগফলে সৃষ্ট সত্ত্বগুণের অস্ত্র দিয়ে বিদ্ধ করা হয় ভঙ্গুর তমোগুণসম্পন্ন আসুরিক কাঠামোকে। এখানেই দেবীর জয়। সত্যসুন্দর সরলতার জয়। তবে অসুরনিধনে কুমারী দেবী রূপমাধুর্যকে যে ব্যবহার করা হয়নি— এমন কথা বলা যাবে কি? রূপের মোহমায়ায় কি দুর্বল করে দেওয়া হয়নি অসুরচিত্তকে? সেটা যে হয়েছে তাতো শুম্ভ নিশুম্ভ' বধপর্বেই পরিষ্কার রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কৌশলে নারীর রূপমাধুর্যকে এবং অন্তর্লীন শক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই দেবীদুর্গার দুই বিপরীতরূপ আমরা দেখতে পাই। দেবতারা প্রয়োজন মাফিক দুর্গাকে অস্ত্র দিয়ে অসুরঘাতিনী বানিয়ে তুলেছে, আবার প্রয়োজন ফুরোলে অথবা অন্য প্রয়োজনে করে তুলেছেন ঘরের মেয়ে। আমাদের সমাজ পরম্পরার দিকে চোখ রাখলেই টের পাওয়া যাবে নারীর এই দুই রূপ ভারতীয় চিন্তনে ফিরে ফিরে আসে। তাই দানবদলনী দুর্গা আর আটপৌরে অসহায়া দুর্গা দুই আমাদের বড় প্রিয়। অসহায়া কেন? ঘরের মরদ অর্থাৎ শিব বাবা নিষ্কর্মা রোজগার করেন না, সংসার চালাতে হয় গৃহিনীকে। মা দুর্গার এই বারমাস্যার কথা শুনলে আপনিও বলতে বাধ্য হলেন— বড় অসহায়া। এই জন্যই বলা হয়েছে— 'এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাবো না। বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।'

দুর্গা কুমারী হলে আমরা জননী দুর্গা বলে কাকে পুজো করি? প্রাচীনকালে মানুষের কাছে কৃষিতে শস্য উৎপাদন ক্ষমতার মতো নারীর প্রজনন ক্ষমতাই তাকে মাতৃরূপী করে তুলেছিল। আসলে কৃষিজ উদ্ভিদের পাতা দিয়ে পুজো করার মধ্যেই শস্যের দেবীরূপে দুর্গাপুজোর তাৎপর্য নিহিত। যে নবপত্রিকা দিয়ে দেবীর বোধন শুরু হয়, তা হল নয়টি উদ্ভিদের সমাহার। কৃষিজ উদ্ভিদের দেবী বলে দুর্গার আর এক নাম শাকম্ভরী। চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে দুর্গার শাকম্ভরী নামের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুনও দেবীকে হে কাত্যায়নী মহাভাগে...শাকম্ভরী বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই শষ্যদেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ। অর্থাৎ দেবী দুর্গা পৃথিবীরই রূপভেদ। বঙ্কিমের ভাষায়— মাতৃভূমি দেশজননী। বেদেও পৃথিবীকে মাতা বলা হয়েছে। এই ধরিত্রী বা পৃথিবীই ক্রমে ক্রমে দেবী দুর্গায় রূপান্তরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন — জগজ্জননীর পুজো আসলে প্রকৃতির আরাধনা। বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা, জলকে আহ্বান করা হয়েছে। তবে কি জগজ্জননীর পুজো আসলে মা-মাটি-মানুষের আরাধনা!

দুর্গাপুজোর জানা-অজানা

বোধন ঃ

'বোধন' কথার অর্থ জাগরণ। হিন্দুদের বৎসর দু'ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি অর্থাৎ নিদ্রা যাবার সময়। দক্ষিণায়ন যে দেবতাদের রাত্রি তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ রয়েছে যে, মাঘ-ফাল্গুন শিশির ঋতু, চৈত্র -বৈশাখ বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু— এই ক'টি ঋতু নিয়ে উত্তরায়ণ হয় যা দেবতাদের দিন আর শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন-কার্তিক শরৎ ঋতু এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত ঋতু—এ তিনটি ঋতু নিয়ে দক্ষিণায়ন যা দেবতাদের রাত্রি। দেবীর পুজো সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা খুব জনপ্রিয় বঙ্গদেশে। রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত। রাবণের বিনাশ হেতু রামচন্দ্র দেবীর আরাধনা করেছিলেন শরৎকালে— 'অকালে'। শ্রীরামচন্দ্রের সেই পুজোই অকালবোধন নামে বিখ্যাত। অবশ্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডী থেকে জানা যাচ্ছে, ভগবান বিষ্ণুকেও নিদ্রা থেকে জাগাতে হয়েছিল মধুকৈটভ বধের জন্য।

কলাবউ ঃ

নয়টি বৃক্ষের শাখাকে একসঙ্গে বাঁধা হয় বলে তা নবপত্রিকা। এই নয়টি বৃক্ষশাখা হচ্ছে—কলাগাছ, দাড়িম্ব, ধান, হরিদ্রা, মান, কচু, বেল, অশোক এবং জয়ন্তী। এই নবপত্রিকাকে অপরাজিতা লতা ও নয়টি পাটের সুতো দিয়ে বেঁধে একটি শাড়ি পরিয়ে কলাবউ সাজানো হয়। যেহেতু বধূ তাই যুগ্মবেল নবপত্রিকার শরীরে সংযোগ করে স্তনরূপে কল্পনা করা হয়। আসলে নবপত্রিকা হচ্ছে নয়টি পত্রযুক্তা স্ত্রীমূর্তি। নবপত্রিকা দেবীদুর্গারই প্রতিনিধি। দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ বধ কালে অষ্ট নায়িকার সৃষ্টি করেছিলেন এবং দেবী স্বয়ং ছিলেন। নয়টি দেবীই শেষে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী বলে গণ্য হয়েছিলেন। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে নতুন লাল পেড়ে শাড়ি, পাতায় সিঁদুরের টিপ, তাতে একগলা ঘোমটা টেনে অবগুণ্ঠিতা নবপত্রিকাকে আলপনা আঁকা চৌকির উপর স্থাপন করা হয়। লম্বা ঘোমটা দিয়ে নবপত্রিকাকে ঢেকে রাখা হয় বলে নবপত্রিকাকে কলা-বউ বলে।

গণেশের পাশে কলাবউ বা নবপত্রিকাকে রাখা হয় বলে কারও কারও ধারণা কলাবউ গণেশের বউ। তবে গণেশের বউ হলে কলা-বউ গণেশের বামে থাকতেন কদাচ ডানদিকে থাকতেন না। কারণ শাস্ত্রকারেরা পত্নীর স্থান বামদিকে নির্দেশ করেছেন। নবপত্রিকা আসলে দেবী দুর্গারই প্রতীক।

বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা ঃ

'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে বেশ্যা শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'স্বনামখ্যাত নারী'। অর্থাৎ যে নারী নিজের নামে নিজেই পরিচিতি পেয়েছে, নিজের নামের মধ্য দিয়ে নিজেকে অন্যের কাছে বিজ্ঞাপিত করতে পেরেছে। তাহলে যে নারী তার কাজের মাধ্যমে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেছে, বিখ্যাত হয়েছে সে কি বেশ্যা? বর্তমান সময়ের হিসেবে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব, কারণ খ্যাতানামা নারীর উদাহরণ আমাদের আজকের সমাজে ভুরি ভুরি। যখন নারী অসূর্যম্পশ্যা ছিল তখনকার সময়ে খ্যাতনামা নারী বলতে হয়তো বেশ্যাকেই বোঝাতো, কিন্তু এখন স্বনামখ্যাত নারীমানেই বেশ্যা। 'শব্দকল্পদ্রুমের এ অর্থ মেনে নিলে তো গোটা সমাজটাই বেশ্যাতে পর্যবসিত হয়।

আসলে প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে বেশ্যা কথাটির অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ। বর্তমানের যারা যৌনকর্মী তাঁরা প্রাচীন ইতিহাস ও শাস্ত্রের হিসেবে বেশ্যা পদবাচ্য নয়। সুপ্রাচীনকালে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করব বললেই সুযোগ পাওয়া যেতনা। বেশ্যা হওয়ার জন্য কতকগুলো মাপকাঠি ছিল এবং তাঁদের এই বৃত্তিতে আসার জন্য নির্দিষ্ট কলানুশীলন করতে হোত। তাঁদের আলোকসামান্য সুন্দরী হতে হত এবং বিবিধ চারুকলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায়, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাজা বেশ্যাদের নিয়োগ করতেন। তাঁদের রক্ষা, শিক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব রাজার। 'গুপ্তবেশ্যা মহাবেশ্যা কুলবেশ্যা মহোদয়া। রাজবেশ্যা দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা চ সপ্তধা' —নিরুত্তর তন্ত্রে শিবের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট যে সেকালে বেশ্যাদের নিজ নিজ কার্যকলাপের নিরিখে এই সাতটি ভাগ ছিল। কামশাস্ত্রের মতে বেশ্যা তিন রকমের— যথা কুম্ভদাসী, রূপজীবী ও গণিকা। আবার রূপজীবীকে ভাগ করা হয়েছে ছয় ভাগে— নটী, কুলটা, স্বৈরিণী, প্রকাশবিনয়ী, পরিচারিকা ও শিল্পকারিকা। সুপ্রাচীনকালে বেশ্যাদের নীচু চোখে দেখা হোত না। 'সমরপ্রদীপ' নামে তন্ত্র-গ্রন্থের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে বেশ্যাদর্শনে শুভ হয়। শাস্ত্রে যাত্রাকালে ধেনু, পূর্ণকুম্ভ, গজ প্রভৃতি মতো গণিকা দর্শনও শুভ। তন্ত্রে বেশ্যাকে কল্পনা করা হয়েছে দশমহাবিদ্যার অংশ হিসেবে। তাই দুর্গাপুজোয়ও দেবীর স্নানে বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকার কথা বলা হয়েছে।

সন্ধি পুজো ঃ

সন্ধিপুজোয় মায়ের চামুণ্ডা মূর্তির অর্চনা হয়। আমাদের জীবনসাধনার শারদলগ্নে মহাপুজোরূপ মহাব্রতের সন্ধিক্ষণে সন্ধিপুজোর মাধ্যমে আমাদের জীববোধ যখন মাতৃবোধের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই দনুজদলনী দশভূজারূপিণী চিন্ময়ী দুর্গা পূজিতা হন মুণ্ডমালিনী চতুর্ভুজা চামুণ্ডারূপে। সন্ধিপুজোয় মা সর্ব আভরণ বিবর্জিতা। সন্ধিপুজোর ১০৮ পদ্ম ও সমসংখ্যক প্রদীপ উৎসর্গ করতে হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ কাহিনী অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন।

কুমারী পুজো ঃ

মহাশক্তির সুনির্দিষ্ট এক অনিন্দিতা রূপময়ী আকৃতির নাম কুমারী। কুমারীপুজো মহাশক্তির সবটুকু সৃষ্টিক্ষমতা আর মাধুর্য মহিমা অনুভব করার আরেক নাম। শিশুকন্যাকে কুমারীরূপে পুজো করার এক সূক্ষ্ম নিদর্শন রয়েছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে। সেই পুরাণ অনুসারে, রাম কর্তৃক রাবণবধের উদ্দেশ্যে দেবতারা যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মার অনুমতি চাইলেন। ব্রহ্মা দেবীকে জাগরিত করার কথা উল্লেখ করলে দেবতারা আদ্যাশক্তির স্তব করেছিলেন। সেই স্তবে

(এরপর ১৪ পাতায়)

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দুর্গোৎসব

(কুমুদবন্ধু সেনের ডায়েরী থেকে)

বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজা বিষয়ে এ যাবৎ দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়। এনিয়ে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কথা আমাদের জানা। অপরজন কুমুদবন্ধু সেনও ওই পূজার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিও তাঁর ডায়েরিতে ওই পূজার বিষয়ে লিখে রাখেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি তা প্রকাশ করেননি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সযত্নে সে-ডায়েরি নিজের কাছে রক্ষা করার পর 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩৬০-৬১, ৯ম সংখ্যা) তিনি ওই পূজার বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ করেন। কুমুদবন্ধু সেনের সেই ডায়েরির কিছু অংশ—

৩১ আশ্বিন (১৭ অক্টোবর ১৯০১), বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন—ধীরে ধীরে যত্নসহকারে ঠাকুর ঘরের নিচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি— আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তরদিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবের এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়—সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। ঝড়জল হইলেও যাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

১লা কার্তিক (১৮ অক্টোবর) ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধন হইল—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন—"

স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমা ও এইদিন কলকাতা বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীজগজ্জননী দুর্গামায়ীর আজ বোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হইলেন পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিতকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন— তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রসুনচৌকীর সানাই মধুর সুরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ কেহ ফলমিষ্টি প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীদুর্গামায়ীর শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

"শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশুবলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন—একদিকে দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা— দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ —বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমলদলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপরদিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা —উপাস্য ও উপাসিকভাবে পূজামণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।

স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথায়' (প্রথম ভাগ) আছে— শ্রীমা বলিতেছেন, 'পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, "মা, আমার জ্বর করে দাও।" ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, "ওমা একি হলো, এখন কি হবে?" নরেন বললে, "কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে, আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।" তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, "ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।" নরেন বললে, "হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি"—বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল। মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ স্বামীজীকে এদিকে-ওদিক পায়চারি, গল্প ও হাস্যকৌতুক করিতে দেখিয়াছি— সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে বসিয়া আছেন— কখনো গুণগুণ স্বরে গাহিতেছেন—

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের
মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও,
আপনি দাও মা করতালি।।

রবিবার মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী দোতলায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে— ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ।

"পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা— ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ— স্বামীজী পূজামণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দন জবা বিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন— কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন? উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল— ভাবগম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল— স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।

"মহানবমীর সন্ধ্যা-অরাত্রিকের পর স্বামীজী স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল।

"৫ কার্তিক মঙ্গলবার বিজয়া দশমী। অপরাহ্ণে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে লোকারণ্য হইল— তখন ঢাক, ঢোল, রসুনচৌকী এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বাদ্য ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল চারিদিকে "মহামায়ী কী জয়— দুর্গামায়ী কী জয়" শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব মনোরম মধুর নৃত্য সকলে নির্বাকভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্যে ভিড়ে নিচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়া মঠের দোতালার বারন্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

"নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘন ঘন উচ্চকণ্ঠে 'মহামায়ী কী জয়— দুর্গামায়ী কী জয়' ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা চলিল— প্রতিমার বিসর্জনে।

পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন। আজও বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনও শুদ্ধ সত্ত্ব ত্যাগী সাধু-ব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজার যে আনন্দ ও অপূর্ব ভাব উদ্দীপিত হয়— তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

(ছবি ও লেখা ঃ স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

বেলুড় মঠের আরতি।

বেলুড় মঠে কুমারী পুজো।

চিঠিপত্র

দেগঙ্গা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গায় একটা গণ্ডগোল চলছে, বাড়ীঘর পুড়েছে, র‍্যাফ নেমেছে, শান্তিমিছিল হবে—এই খবরগুলো কিছু দৈনিক খবরের কাগজে বেরিয়েছিল এবং দু'একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমও খবরটি প্রচার করেছিল, কিন্তু সকলেই ব্যাপারটিকে 'গোষ্ঠী সংঘর্ষ' বলে প্রচার করে গেছে। ওই গোষ্ঠী যে কোন্‌গুলি সেই সত্যটি প্রকাশ করার দায়িত্ব তাঁরা নেননি। এবার মনে হচ্ছে তারা 'ভগবান ছাড়া' অন্য কোন কিছুকেও তাহলে ভয় পান! একমাত্র আপনাদের কাগজটি থেকেই আসল ঘটনাটা জানা গেল। জানা গেল হিন্দুরা ওখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ছবিতে দেখা গেল মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও আসল কথাটা বলা চলবে না কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা তো ক্ষেপে যেতে পারে! কর্তারা মনে করেন ছোটভাই অন্যায় করলেও বড়ভাইকে রাগ করতে নেই! তাই বড়কে উপদেশ আর আক্রমণকারীরা ছোট ভাইয়ের দিক থেকে কেউ হলে তাদের শুধুই স্তবস্তুতি করে যেতে হবে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের

দেশে এটাই গণতন্ত্রের বিচিত্র ধারা! সোমনাথের মন্দির তো একজনই ১৭ বার আক্রমণ করেছে। আমরা সব সয়েছিনা? এটা কেন ভুলে যাচ্ছি? অহিংসার অবতার আমাদের 'মহাত্মা' তো এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন!

আর যাঁরা বঙ্গভূমিতে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন এবং সেই পরিবর্তনের হাওয়া যখন খরবায়ুরূপে বইতে শুরু করেছে, তখন তাঁরা ইফতার পার্টিতে টুপি ও আলখাল্লা পরে দুহাত সামনে মেলে 'মোনাজাত' (প্রার্থনার) ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে সম্প্রীতির স্বার্থে আমাদের সকলকে আগামীদিনে যখন পরিবর্তনের ষোলকলা পূর্ণ হবে তখন কি করতে হবে। ছবিতে এটাও দেখলাম!

—প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটুলী, কলকাতা।

'জাত ক্রিমিন্যাল'

গত ২৩ আগস্ট প্রকাশিত 'স্বস্তিকা'র সাপ্তাহিক সংখ্যায় নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের 'সংসদীয় গণতন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা' প্রসঙ্গে আমার এই চিঠি। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতির জনক সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নন্দীগ্রামে নারকীয় তাণ্ডব চালায়। বোমা ও গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারায় বেশ কয়েকজন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ, শহীদের রক্তে সিক্ত হয় নন্দীগ্রামের মাটি। মা-মাটিকে রক্ষা করতে উপহার দিতে হয় তাজা প্রাণ, শুধুমাত্র অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রান্ত শিল্পনীতির জন্য। লক্ষ্মণ শেঠের হার্মাদ বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পায়নি মা-বোনেরা, চোখের জলে ভাসে নন্দীগ্রাম। সেই অভিশপ্ত ঘটনার সাক্ষী ছিল পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ জনগণ। দিনটির কথা সবারই জানা—১৪ মার্চ ২০০৭। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর কুকীর্তির বিবরণ দিতে গিয়ে মাননীয় প্রতিবেদক মহাশয় লিখেছেন— "২০০১ সালের মার্চে মুখ্যমন্ত্রীর উর্দিধারী ও উর্দিহীন গুন্ডারা..."। এটা এক গুরুতর ভুল।

প্রতিবেদক যথার্থই লিখেছেন—বুদ্ধ বাবু আজ জনগণের মন্ত্রী নন। পদলোভী অবিবেচক একজন জাত-ক্রিমিন্যাল।

—সমীর কুমার পড়্যা, পাঁউশী, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

সমবায় ব্যাঙ্কে ব্যাপক দুর্নীতি

রামকৃষ্ণপুর সমবায় ব্যাঙ্ক ১৯৬৫ সালে ৩০ জানুয়ারী Co-operative Society হিসাবে নথিভুক্ত হয়। ১৯৮৩ সালে ৩০ এপ্রিল ত্রপ্সন্তুনন্দ্বদ্ধন্ত সদস্যরা Banking Business-এর জন্য আর. বি. আই.-এর নিকট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করে এবং তা অনুমোদিত হয়। বিগত ৪৫ বছরে ব্যাঙ্কের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫ হাজার। সম্প্রতি ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী বা Board of Directors R.B.I.-এর নিয়মকানুন লঙঘন করেন এবং অগণতান্ত্রিক ও আইন বহির্ভূত ও অসৎ উপায়ে গ্রাহকদের সঞ্চি ত অর্থ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি র কাজে ব্যবহার করেন। ফলে ২০০৯ সালে ২৫ আগস্ট আর. বি. আই. এক নির্দেশে ব্যাঙ্কের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে এবং এক হাজার টাকার বেশি অর্থ গ্রাহকরা সপ্তাহে ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারবেন না বলে নির্দেশ জারি করা হয়। কার্যত এখন এই ব্যাঙ্কটি প্রায় বন্ধের মুখে। ফলে গ্রাহকরা চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। বহু গ্রাহক তাদের জীবনের সঞ্চ য় এই ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। তারা এখন আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। পত্র দিলে কোনও রিপ্লাই পাচ্ছেন না। ব্যাঙ্কের কাস্টমার ফোরাম-এর সভাপতিও ব্যাঙ্কের ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজন-পোষণের বিষয় আর. বি. আই., সমবায় মন্ত্রী ত্ত.্ম.ট্ট, ত্ত.ত্ন., জেলাশাসক ও মহকুমা শাসক (Howrah)-কে অবহিত করলেও এ বিষয়ে কেউই কর্ণপাত করছেন না।

—আশিস রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া।

দেশভাগের দায়-দায়িত্ব

দেশভাগের ব্যাপারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে একটা বড় ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত মহাশয় প্রধানত তাঁর ৯.১১.০৯ তারিখের নিবন্ধে পরিবেশিত তথ্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করে ৯.৮.১০ তারিখের পত্রের উপসংহারে প্রশ্ন রেখেছেন, ওই বিষয়ে আমার ভিন্নমত আছে কিনা। তাই, শুরুতেই বলে রাখি—হ্যাঁ, আছে এবং তা ১০০ শতাংশ। মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে, মৌলানা আজাদ এবং তাঁর 'India Wins Freedom' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া যাক।

১৯৪৭-এর জুনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সভায় দেশবিভাগের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, রামমনোহর লোহিয়া এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ আমন্ত্রিত হয়ে ওই সভায় হাজির ছিলেন। লোহিয়া বলেছেন, সভায় তাঁরা দু'জন ব্যতিরেকে শুধু গান্ধীজী এবং খান আবদুল গফ্‌ফর খান দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন; আর কেউ টুঁ শব্দ করেননি। মৌলানা আজাদ সভাকক্ষের এককোণে চেয়ারে বসে অবিরাম ধূমপান করেছেন;একটি কথাও বলেন নি " । মৌলানা আজাদের গ্রন্থটি পড়ে আমাদের ধারণা জন্মাবে, যেন একমাত্র তিনিই শেষপর্যন্ত দেশবিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন,—"...the only one to stay opposed to partition right upto the end"। ওই সম্বন্ধে লোহিয়ার তীক্ষ্ণ মন্তব্য—"The whole story is an uninteresting lie"–p. 18)। উল্লেখ্য, A.I.C.C.-র অধিবেশনে (জুন, ১৪-১৫) পন্ডিত পন্থ ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন;মৌলানা আজাদ সমর্থক (secondergু ছিলেন। শ্রীরক্ষিত ঠিক জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবটি ১৫৭-২৯ ভোটে গৃহীত হয়েছিল;৩২ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থেকে ছিলেন। অথচ, আজাদ তাঁর গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৮) বলেছেন—প্রস্তাবটি ২৯-১৫ ভোটে গৃহীত হয়েছিল এবং মন্তব্য করেছেন—"Even Gandhiji appeal could not persuade more members to vote for the partition of the country."।

মৌলানা আজাদ দেশভাগের বিরোধী ছিলেন এবং গান্ধীজীকে তিনি তাঁর অভিমত খোলাখুলি বলেছিলেন। আজাদের ওই দাবি নস্যাৎ করে আচার্য কৃপালনী বলেছেন, একান্ত আলাপ-সালাপে আজাদ গান্ধীজীকে কি বলেছেন, তা তিনি জানেন না। যা জানেন তা হলো, ওয়ার্কিং কমিটি বা এ. আই.সি.সি.-তে আজাদ কখনো দেশভাগের বিরোধিতা করেননি। ("...All I Know is that he never opposed it in the Working-Committee or the A.I.C.C."-(Gandhi : His Life and Thought'; p. 289)। অনেকের কাছে মৌলানা আজাদের বচন 'Gospel Truth';তাই এত কথা বলতে হল। কেহ যদি একে 'ধান ভানতে শিবের গীত' বলেন, বলতে পারেন;আমি নাচার। অতঃপর, সর্দার প্যাটেল প্রসঙ্গে আসা যাক।

'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম্'-এর সূত্র ধরে রক্ষিত মহাশয় বলেছেন—মাউন্টব্যাটেন একটা বৈঠকেই দেশবিভাগের সুফল ব্যাখ্যা করে প্যাটেলকে কাবু করেছিলেন। ঘটনা হল, মাউন্টব্যাটেনের সাথে মোলাকাতের অনেক আগেই প্যাটেল বুঝে গিয়েছিলেন, মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে চলা অসম্ভব। প্রমাণ, তাঁর উদ্যোগে ৮ মার্চ ওয়ার্কিং কমিটির পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ।

লিওনার্ড মসলেকে উদ্ধৃ ত করে রক্ষিত মহাশয় বলেছেন, বৈঠক শেষে প্যাটেল চলে যেতেই মাউন্টব্যাটেন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"...He seemed to be such a hard nut. Yet I once cracked the shell, he was all pulf."। রক্ষিত মহাশয়ের ভাষায়—প্যাটেলকে শক্তপোক্ত নেতা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভেতরটা একেবারে 'ফাঁপা'। মসলে কিন্তু ওই বৈঠকে সম্পর্কে এও বলেছেন—"...when Mountbatten explained the full implication of the resolution Patel feigned ignorence and allowed himself to be persuaded that by accepting the division of the Punjab he had recognised the principle of Indian Partition; and it was even more slowly and unwillingly that he had affored to accept Mountbatten's contention that this was, perhaps, the way out after all."। অর্থাৎ, অযথা বাক্যব্যয় না করে বোকা সেজে বসে থেকে সব কথায় সায় দিয়ে প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনকে বুঝতে দিয়েছিলেন যে, তিনি প্যাটেলকে কবজা করে ফেলেছেন। আসলে, ওই বৈঠকের মাধ্যমে প্যাটেলেরও মাউন্টব্যাটেনকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারটা ছিল। একটা বৈঠকেই মাউন্টব্যাটেন প্যাটেলকে ধরাশায়ী করেছিলেন, ওটা মৌলানা আজাদের স্বকপোলকল্পিত ভাবনা। সর্দার প্যাটেল যে কত শক্তপোক্ত পুরুষ ছিলেন ভারত সরকারের সংবাদ-দপ্তরের সেক্রেটারি জি এস বক্তম্যানের কথায় তা মালুম হবে। মাউন্টব্যাটেনের প্রেস-অ্যাটাসে ক্যাম্বেল জনসনকে তিনি বলেছিলেন যে, বল্লভভাই প্যাটেলের দপ্তরে এতদিন ধরে কাজ করে তিনি ওই মানুষটির সম্বন্ধেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, প্যাটেল হলেন ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। যদি প্যাটেলকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে সে আলোচনা বা সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন ফলই হবে না ('ভারতে মাউন্টব্যাটেন';পৃঃ ৩৬-৩৭)। উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন মাউন্টব্যাটেনের পাল্লায় পড়ে প্যাটেল বা নেহরু দেশভাগে সম্মত হয়েছিলেন, এই অভিযোগ সঙ্গত নয়। ভুললে চলবে না যে, ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রস্তাবে কংগ্রেস কার্যত পাকিস্তান মেনে নিয়েছিল, ("...had unanimously passed resolutions directly or indirectly conceding pakistan, in 1934, 1942, 1945, and March 1947"; 'The History and Culture of the Indian people'–Vol.-XI; p. 747)। মাউন্টব্যাটেন এলেন, আর নেহরু-প্যাটেলকে হাত করে নিয়ে দেশভাগ করে দিয়ে চলে গেলেন, শিশুসুলভ ওরকম তত্ত্ব নাকচ করে লোহিয়া বলেছেন—"The string of partition of India must have been there in the India Office of Britain for a very long time. On my knowledge of the doings of the British Government as of any other experienced government, I have sapely deduced that it was there well before Mr. Jinnah started talking of it around 1940"–(p. 20)। দেশবিভাগ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সওয়াশতক বৎসরের ঘটনা পরম্পরা পর্যালোচনা করে বলেছেন—"দেশবিভাগের অনুকূল অবস্থা এবং তার অনিবার্যতা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। তার পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের ইতিহাস। গান্ধীজি পরিস্থিতির কাছে পরাভূত হয়েছিলেন। দেশবিভাগের এইটিই হল পশ্চাৎ কাহিনী"—('দেশবিভাগ ঃ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী'—পৃঃ ১৮৪-৮৫)। ১৩ জুন এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনেও ওই সুর বেজেছিল। গান্ধীজী তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেছিলেন—"...but sometimes certain decisions, however unpalateble they might be, had to be taken"। আজাদ অনতিক্রম্য দুঃসহ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন–"...the Congress had no alternatives"।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—"...But those who carefully review the history of Hindu-Muslim relations from the beginning of the 19th century, Pakistan can only be regarded as the logical culmination of political development in India..." ('History of Freedom Movement in India'; p. 622)। বস্তুতঃ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এক দীর্ঘ পত্রে ২ মে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন—"...whether division of India takes place or not, it is essential that the Punjab and Bengal should be partitioned..."। তিনি সর্দার প্যাটেলকেও ওই মর্মে পত্র দিয়েছিলেন— (দ্রঃ 'শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ'—ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ;পৃঃ ২৮৫, ৩১২)।

সবকিছু হয়তো গুছিয়ে বলতে পারলাম না;তবে দেশভাগের ব্যাপারে ভূমিকার অভিযোগে সর্দার প্যাটেলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করবার আগে ভাববার মতো কিছু কথা, মনে হয়, বলতে সক্ষম হয়েছি।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা।

পরম্পরা

পটের দুর্গা

।। নির্মল কর।।

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে আদি গঙ্গার তীরে কালীঘাটের মন্দিরকে ঘিরে বসতি স্থাপন করেছিলেন একদল মানুষ, যাঁদের পেশা ও নেশা ছিল ছবি আঁকা। সস্তা পাতলা কাগজের ওপর তাঁরা আঁকতেন পল্লী-প্রকৃতি, পশুপাখি, কলকাতার পথঘাট, কলকাতার বাবুসমাজ, তৎকালীন সামাজিক কু-প্রথা আর ঠাকুর দেবতার ছবি। এইসব স্বভাবশিল্পীরা বছরের অন্যান্য সময় পটে-আঁকা ছবি দেখিয়ে এবং গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করতেন। তাঁরা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন শারদীয়া পুজোর আগে। শিল্পীরা নিজেদের ঘরের দাওয়ায় খেজুর পাতার চাটাই পেতে দুর্গার পট আঁকতে বসে যেতেন। তাঁদের চিত্রিত-পটে ফুটে উঠত বাংলার শরতের মেঘ-মেদুর কোমলতা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আর তাঁদের বাহন।

আদিতে মৃন্ময়ী মূর্তি-পুজোর বদলে ঘটে পটে দুর্গাপুজোর প্রচলন ছিল বেশি। দুর্গা সপরিবারে বাহনসহ পটে চিত্রিত হয়ে পূজিত হতেন। এটা শহুরে মানুষের কাছে তো বটেই, গ্রামের মানুষের কাছেও গল্পকথা বলে মনে হবে। কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার যেসব দুর্গাপট উপাসিত হয়েছে, সেসবের একটিও রক্ষা পায়নি। দুই-আড়াইশো বছরের প্রাচীন দু'-একখানা দুর্গাপট কোনও সংগ্রহশালায় দেখা গেলেও সেগুলি প্রতিমাজ্ঞানে উপাসিত হবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাংলায় পটের ব্যবহার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় ব্যাপক হলেও দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্র ছাড়া দুর্গাপটের ব্যবহার উঠে গেছে। একমাত্র বীরভূম জেলার নানুর থানার হাটসেরান্দি গ্রামে গত দু'শ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় পটে আঁকা দুর্গাপুজো হয়ে আসছে।

চৌদ্দ-পাড়ার বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই হাটসেরান্দি। সদ্‌গোপ, কৃষিনির্ভর ব্রাহ্মণ, বাউরি, বাগ্‌দি এবং সূত্রধর মিলিয়ে গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ছয় সহস্রাধিক। এখানকার গ্রাম্যদেবতা ধর্মরাজ আদিরাক্ষস-এর সঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসব এক সময় খুবই রমরমা ছিল। হাটসেরান্দি গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পটের প্রতিমা আজ কিংবদন্তিতে পরিণত। সাবেককালের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এখানে এক চমৎকার নিদর্শন হয়ে আছে। জনশ্রুতি যে, পট-পুজোর প্রবর্তক গ্রামের চাটুজ্যে পরিবারের অষ্টম-পুরুষ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় একবার শারদোৎসবের প্রাক্কালে আর্থিক কারণে মূর্তি গড়ে দুর্গাপুজো করতে না পেরে যখন শোকে বিমূঢ়, তখন এক অচেনা কিশোরী তাঁর কাছে এসে অল্পব্যয়ে ঘটেপটে পুজো করার পরামর্শ দিয়ে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়। এটা দেবীর আদেশ মনে করে গঙ্গাধর তাঁর ঠাকুরদালানে পটে আঁকা দুর্গাপুজো শুরু করেন। সেই থেকে দু'শ বছর ধরে চাটুজ্যে পরিবারে এবং গ্রামের আরও কয়েকটি গৃহ মিলিয়ে মোট চৌদ্দটি পরিবারে চিত্রিত-পটে দুর্গোৎসব চলছে। ঘট প্রতিষ্ঠা করে শুধু সন্ধিপুজো হয় দু'টি পরিবারে। হাল আমলের বারোয়ারি পুজো একটি। বস্তুত হাটসেরান্দি গ্রামেই পটে-আঁকা প্রতিমা পুজোর সেই সনাতন রীতি সমৃদ্ধি লাভ করে। কেননা, এখানকার সাত পুরুষের পটুয়া শিল্পী-পরিবার বিশেষ কারিগরি জ্ঞান ও বংশগত চর্চায় দুর্গাপট অঙ্কনে সেই মধ্যযুগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দিকে সক্রিয় ছিলেন। চাটুজ্যেদের পট দৈর্ঘে-প্রস্থে পাঁচ ফুট। পটের এই দেবী আকারে-প্রকারে, রূপে জৌলুসে, ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে মৃন্ময়ী প্রতিমার চেয়ে এক ক্রান্তিও কম নয়। আরতির পঞ্চ প্রদীপ প্রদক্ষিণ করে সেই পট যখন ধূপধুনো আর নানা ফুলের গন্ধে বাতাসকে মাতোয়ারা করে তোলে, তখন হাতে-আঁকা চিত্রিত এই পট হয়ে ওঠে নিখুঁত প্রতিমাই। এই দুর্গাপট সারা বছর ধরে দুর্গাদালানে শোভা পায়।

দুর্গার পটগুলি নানা হাতিয়ার ও উপকরণে গড়ে ওঠে। মাটির খুরি, ছাগলের ঘাড়ের লোমের তৈরি ছোটবড় তুলি, ঘন বুনটের কাপড়, এক বাখারির কাঠামো, মিহিগোলা মন্ড, তেঁতুল বিচির গুঁড়ো সেদ্ধ-করা আঠা আর নানাবিধ রঙ। এককালে কুলগাছের লাহা বা লাক্ষা থেকে লাল, ধোপাদের ব্যবহৃত নীলের দানা থেকে নীল, গিরিমাটি থেকে কমলা বা হলুদ, প্রদীপের ভুসো থেকে তোলা কালি, হরিতাল, পিউড়ি বা গোমূত্র থেকে তৈরি হলদে রঙ এবং আয়রণ সালফেট জাতীয় রং ব্যবহৃত হয়।

পটে ছবি আঁকার আগে চালচিত্র সমেত প্রতিমার আয়তন অনুযায়ী প্রথমে একটি বাখারির কাঠামো তৈরি করা হয়। তারপর তার ওপর টানটান করে লাগানো হয় মিহি কাদার প্রলেপ মাখানো একখণ্ড শুকনো কাপড়। ওই কাপড় শুকিয়ে গেলে তার ওপর খড়ি-গোলার সাদা আস্তরণ বুলিয়ে তৈরি করা হয় পটের জমি। তারপর সরু তুলি দিয়ে ফিকে লাল রঙের প্রান্তরেখা টানা হয়। বাঁকানো চালচিত্রের নীচে পশ্চাৎপটের খালি অংশটি ভরাট করা হয় ঘন নীল রঙে। চালচিত্রের ঊর্ধাংশে নানা দেব-দেবীর রঙিন মূর্তি আঁকা। মাঝখানে দুর্গার ঠিক মাথার উপরে ভোলা মহেশ্বরের শয়ান-মূর্তি, যার দু'পাশে সিংহবাহনা কালী, কৃষ্ণ-রাধিকা, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের দৃশ্য। রঙের প্রয়োগ ও চালচিত্রের বর্ণনা একইভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। অঙ্কন পদ্ধতিও বংশানুক্রমিকভাবে বিধিবদ্ধ।

পটের তুলির টানে প্রতিমাগুলি একে একে পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। শিল্পীর নিপুণ তুলিতে রঞ্জিত হয় দেবী মুখ। সবচেয়ে সরু তুলিতে হয় চক্ষুদান। দুর্গার মুখ হাত পায়ের রঙ কমলা-মেশানো তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, শাড়ি লাল এবং উড়ানি সবুজ। লক্ষ্মীর দেহ-বরণও অনুরূপ। শাড়ি লাল কিন্তু উড়ানি ফিকে নীল। সরস্বতী শুভ্রবরণা, ফিকে নীল শাড়ি পরিহিতা, উড়ানি হলদে। কার্তিকের অবয়ব হরিদ্রাভ, দেহ-বরণ সবুজ, ধুতি সাদা আর তাঁর বাহন ময়ূর অংশত সবুজ, হরিদ্রাভ

এবং খয়েরি। গণেশের মুখমণ্ডল শুভ্র, দেহ কমলা, ধুতি হলদে। অসুরের গাত্রবর্ণ সবুজ, পরণে লাল ধুতি। সিংহের রঙ অংশত হরিদ্রাভ ও খয়েরি।

যথারীতি নির্ঘণ্ট অনুযায়ী পুজো শুরু হয়। ষষ্ঠীর সকাল থেকে গ্রামের পুজোর বাড়িতে আত্মীয় বন্ধু ও অতিথি সমাগম হয়। সন্ধ্যেয় ষষ্ঠীর বোধন দিয়ে পুজোর সূচনা। সপ্তমীর ভোর হয় সানাইয়ের সুরে। মণ্ডপে মণ্ডপে পুজোর মধুময় মন্ত্রে, সন্ধ্যারতিতে, ঢাক-ঢোলের বাজনায় তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত হয়। বিজয়ার অপরাহ্নে পট-বিসর্জনের পালা। গত বছর যে-দুর্গাপটের পুজো হয়েছিল, এবছর তার বিসর্জন। আর এবছর যে-পটের পুজো হবে সেটা বিসর্জিত হবে আগামী বছর।

অর্ধশতাব্দী আগে হাটসেরান্দি গ্রামের পটের পুজোর বেশ জাঁকজমক ছিল। বাজনা-বাদ্যি বাজত, পুজোর বাড়িতে গ্রামশুদ্ধু মানুষজনের ভুরিভোজের আয়োজন ছিল। রেওয়াজ ছিল 'কারণ' পানের ও বলিদানের। সে সব এখন অনেক কমেছে। সপ্তমীর দিন চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে আর নবমী পুজোয় পশুবলি। এককালে যেখানে পশুবলি নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল, সেইসব পরিবারে এখন আর্থিক অনটনের কারণে নিছক আখ, চালকুমড়ো দিয়েই বলিদান পর্ব সারা হয়। কোনও কোনও সন্ধিক্ষণে বলিদানের বদলে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় পায়েস বা পরমান্ন। কারণ আজকের দুর্মূল্যের বাজারে চারদিনের পুজো চালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। পারিবারিক পটের দুর্গোৎসবগুলির উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁকজমক বছরের পর বছর হ্রাস পাচ্ছে। কয়েকটি বনেদি পরিবারের পুজোও বন্ধ হয়ে গেছে। আর বাজনাবাদ্যিই শুধু নয়, ভোজের আয়োজনও তেমন হয় না এখন। সন্ধ্যারতির পর কোনও পুজো প্রাঙ্গণে সেকালের মতো যাত্রা কীর্তন আর কবিগানের জমাটি আসরও বসে না। মঞ্চ স্থ হয় না সখের থিয়েটার, শোনা যায় না লেটো গান। হ্যাজাক, ঝাড়বাতি, সেজ-এর ব্যবহারকে সরিয়ে হাটসেরান্দি গ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিদ্যুতের রোশনাই। তাই পুজো মণ্ডপগুলি এখন বৈদ্যুতিক আলোকমালায় ঝলমল করে। এভাবে নানা পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যেও হাটসেরান্দি গ্রামের পটের-পুজোগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের সেই শিশিরভেজা ঘাস, শিউলি ফুল, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ার খেলা, সোনায় ভরা সন্ধে আর রাতের চাঁদের আলো আকাশজোড়া শুদ্ধতা— এসবের তো এখনও কোনও পরিবর্তন ঘটেনি!

এবছর দেবীর বোধন কবে কখন?

স্বদেশ রঞ্জন চক্রবর্তী

সকলেই জানেন ও অনুষ্ঠিত হয়— যে ষষ্ঠীরদিন পূর্বাহ্নে দেবী দুর্গার পূজার প্রারম্ভ অর্থাৎ কল্পারম্ভ (ষষ্ঠ্যাদিকল্পে) এবং সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। কিন্তু বর্তমান বর্ষে গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি পঞ্জিকায় উল্লিখিত হয়েছে ২৬ আশ্বিন বুধবার পূর্বাহ্ন ৮।২৯ মধ্যে দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও বোধন প্রশস্ত। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশ কি আলোচনার বিষয়—

ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাযু কারয়েৎ।— ভবিষ্যপুরাণে যার অর্থ হলো— অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ। মন্ত্রটি কালিকাপুরাণ হতে উদ্ধৃত। অর্থ হলো— আমিও আশ্বিনের ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যাবেলা দেবীর বোধন করি। যুগ্মশাস্ত্রানুসারে উভয়দিন ষষ্ঠী প্রাপ্ত হলে পরদিনে বোধন হবে। কারণ সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠী গ্রাহ্য। কৃত্য চিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে— পত্রী প্রবেশাৎ পূর্বেদ্যুঃ যা তিথিঃ প্রতিপদ্যতে। তত্রৈব বোধয়েদ্দেবীং নাত্র ষষ্ঠী পুরস্ক্রিয়া।।

অর্থাৎ-নবপত্রিকা প্রবেশের পূর্বদিবসে (সপ্তমীপূজার আগের দিন) যে তিথিই হোক সেদিনই দেবীর বোধন হবে। সেখানে ষষ্ঠী তিথির কোন ব্যাপার নাই। কৃত্য চিন্তামণিকার এতাদৃশ অভিমত প্রকাশ করলেও অন্য কোনও সংহিতাকার সহমত পোষণ করেননি।

দ্বিতীয়তঃ বোধনের মুখ্য কাল যে সায়ংকাল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। হয়শীর্ষ পঞ্চ রাত্রে বলা হয়েছে— বিল্বপাদপমভ্যেতি পূজার্থং সায়মম্বিকাম্। অর্থাৎ-অম্বিকার পূজার জন্য সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষের নিকট গমন করবে। কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে— বোধয়েদ্বিল্ব শাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ। যার অর্থ হলো— ষষ্ঠী তিথিতে বিল্ব শাখায় ও ফলে দেবীর বোধন করণীয়। যদাতুভয়দিনে সায়ং বিনাপি ষষ্ঠীলাভস্তদা পরদিনে পূর্বাহ্নে ষষ্ঠ্যাং বোধনং—তিথিতত্ত্বে, যখন উভয়দিনে সায়ংকালে ষষ্ঠী তিথি থাকবে না তখন পরদিনে পূর্বাহ্নে দেবীর বোধন হবে।

তৃতীয়ত, সায়ংকাল নির্ণয়—

প্রদোষ— প্রদোষোহ স্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে।—বৎস।

বৎসের মতে— সূর্যাস্তের পর মুহূর্তদ্বয় হলো প্রদোষ। (৪৮ মিঃ×২ মুহূর্ত)

আবার সন্ধ্যা সম্পর্কে বরাহমিহিরের মত হলো— অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা যাবৎ। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর যতক্ষণ ন তারকারাজি স্পষ্টভাবে দৃষ্টি গোচর হয় সেই সময় হলো সন্ধ্যা।

আবার মহাকবি কালিদাস বলেছেন— দিন ক্ষপামধ্য গতেব সন্ধ্যা। অর্থাৎ দিবস ও রাত্রির মধ্যভাগ সময় সন্ধ্যা। তবে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতই গ্রাহ্য।

২৬ আশ্বিন বুধবার ষষ্ঠীর স্থিতিকাল ৫।৫।৪২ সেকেন্ড এবং সূর্যাস্ত ৫।১০।২৬ সেকেন্ডে। সন্ধ্যাবেলা ষষ্ঠী পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ০।৪।৪৪ সেকেন্ড। সুতরাং কর্মযোগ্যকাল পাওয়া যাচ্ছে না। আরও বলা হয়েছে 'রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্বকর্মসু' সন্ধ্যার ওইসময় রাক্ষসীবেলা নামে অহিহিত। ওই সময় সমস্তরকম শুভ কাজ নিষিদ্ধ। পূর্বদিন সন্ধ্যা ৫।১৮ মি. এর পর ষষ্ঠী তিথির শুরু। ওইদিন বোধন করা যাইতে পারিত কিন্তু যুগ্ম শাস্ত্রানুসারে সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠীর সমাদর, তা ছাড়া সাধারণ বিধি অনুসারে শুক্ল পক্ষে সূর্যোদয়কালীন তিথির গ্রহণ যোগ্যতা শাস্ত্র সম্মত।

অতএব দেখা যাচ্ছে স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সাধারণ ও বিশেষ বিধি (যুগ্মশাস্ত্র) অনুসারে বুধবার ২৬ আশ্বিন সন্ধ্যাবেলা দেবীর বোধন সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং স্মার্ত প্রবর রঘুনন্দন নির্দিষ্ট বুধবার পূর্বাহ্নে বোধনই যথার্থ শাস্ত্র সঙ্গত।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

ব্যতিক্রমী পাঠক্রম

আজকাল শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন-নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সেইসঙ্গে নতুন নতুন পাঠক্রমের নতুন কেরিয়ারের পরিধিও বাড়ছে। দু'টি ব্যতিক্রমী পাঠক্রমের সন্ধান দিচ্ছেন নীল উপাধ্যায়।

শিল্প ক্ষেত্রে সুরক্ষার পাঠক্রম

শিল্পে উৎপাদন বা পরিষেবায় নানা ধরনের কাজের পাশাপাশি একটি বিশেষ দিক হলো সুরক্ষা বা নিরাপত্তা। কোনও কারখানা বা সংস্থা যাতে দুর্ঘটনায় না পড়ে, এবং অকস্মাৎ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে যাতে লোকজন সম্পত্তি ও পরিবেশের ক্ষতি না হয়, সেজন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফ্‌টি'র ওপর নজর দিচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি। এ বিষয়ে প্রশিক্ষিতরা শুধু সুরক্ষার আয়োজনে নয়, সংস্থার সুরক্ষা-সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এই পাঠক্রমের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ অন্যান্য বিষয়েও সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। সরকারি বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও নানা রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠানেও কাজের সুযোগ রয়েছে।

সার্টিফিকেট, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি কোর্সও রয়েছে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি, রুরকির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফ্‌টি এবং হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স করানো হয়। মিনিস্ট্রি অব্ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট-এর অন্তর্গত ডায়রেক্টর জেনারেল, ফ্যাক্টরি অ্যাড্‌ভাইস সার্ভিস অ্যান্ড লেবার ইন্‌স্টিটিউটগুলিতে এক বছরের অ্যাড্‌ভান্সড্ সার্ভিস অ্যান্ড অ্যাড্‌ভান্সড্ ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফ্‌টি কোর্স আছে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ও অঙ্কে স্নাতক বা ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে এই কোর্সে আবেদন করা যেতে পারে। কলকাতায় লেকটাউনে ডিরেক্টর ইনচার্জ, রিজনাল লেবার ইন্‌স্টিটিউটে (০৩৩-২৫৩৪-২৭৩২) এই বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে। দূর-শিক্ষার মাধ্যমেও এই কোর্স করা যায়। হরিয়ানার গুরু জম্বেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় ছভ্রভ্রভ্র.ঋদত্ত.ন্দ্বক্তন্দ্বব্ধ.নগ্ন থেকে। এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা

যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। এই বিশ্বায়নের যুগে প্রায় প্রত্যেকটি দেশেরই অন্য বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো সম্পর্কগুলির পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নতুন সম্পর্কও। বিশ্ববাজারে নানা ক্ষেত্রে দিন দিন যত নতুন নতুন সংস্থা যোগ দিচ্ছে, ততই বাড়ছে প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক বাজারে কোথায় কী হচ্ছে, কী ধরনের পন্থার সাহায্যে বাজারে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকা যায়, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হচ্ছে— যেসব সংস্থা বিদেশের বাজারে ব্যবসা গড়ে তুলতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলি খুবই জরুরি। এরজন্য চাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা আমদানি-রপ্তানির মতো বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মী। তার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে।

(এরপর ১৪ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ১১

পরশুরাম যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করলেন। দেবসেনাপতি কার্তিক তাঁকে সাহায্য করলেন।

সদানন্দ মহাদেব খুশি হয়ে তাঁকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র দিলেন। সেজন্যই তখন থেকে তিনি 'রাম' থেকে 'পরশুরাম' নামে বিখ্যাত হলেন।

ফেরার পথে পরশুরামের এক শিষ্য হোল, তার নাম অকৃত। তাকে সঙ্গে নিয়েই মা-বাবার আশ্রমে পৌঁছালেন।

চলবে।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

মেধা বাড়াতে সুর

শিশুদের আরও বেশি বুদ্ধিমান করে তুলতে পারে সঙ্গীত। সুরের ছোঁয়া ছোটদের কোনও বিষয় বোঝার ক্ষমতা, মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। বিদেশি ভাষা-শিক্ষা বা অঙ্ক কষার মতো কঠিন বিষয়গুলি তখন অনেকটাই সহজ হয়ে যায় তাদের কাছে। আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীর গবেষণায় দেখা যায়, সঙ্গীত বোঝার ক্ষেত্রে যে উদ্যম প্রয়োজন তা মস্তিষ্কের সম্প্রসারণ ঘটায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সঙ্গীতচর্চাকারী অথবা নিয়মিত সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্ত স্কুল-পড়ুয়ারা বিভিন্ন বিষয়েই তাদের সহপাঠীদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। বড়দের শারীরিক ও মানসিক গঠনের উন্নতিতেও সঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে গবেষকদের দাবি।

অস্ত্রোপচার করবে রোবট

ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অপারেশন থিয়েটারে রোবটের অস্ত্রোপচারের দৃষ্টান্ত নতুন নয়। এবার স্বয়ংক্রিয় রোবট মানুষের সাহায্য ছাড়াই রোগীর ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ বা পেশিগুলিকে চিহ্নিত করে সেই ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচারের নানা উপকরণ নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এর জন্যে রোবটের হাতের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে এক বিশেষ আলট্রাসাউন্ড যন্ত্র, যা রোবটের চোখের কাজ করবে এবং সঠিক পেশি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এবং সফল করবে অস্ত্রোপচার। ওয়াশিংটনের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর গবেষকদল জানিয়েছেন, রোবটের সাহায্যে অপারেশনের সাফল্য চিকিৎসকদের থেকে বেশি ছাড়া কম হবে না।

স্টেম চিকিৎসায় পক্ষাঘাতও সারছে

লন্ডনের নারা ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষকরা জানিয়েছেন, মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাতে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের অস্থিমজ্জা বা স্টেমসেল প্রতিস্থাপন করে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব। নিউরাল স্টেম সেলের সাহায্য আঘাতপ্রাপ্ত কোষের বিকল্প কোষ গঠন করে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে স্থাপন করলে রোগী কর্মক্ষমতা ফিরে পাবে। তারপর তাঁর দেহে প্রবিষ্ট করানো হবে ভ্যালপ্রয়িক অ্যাসিড, যা কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের জন্যে বহুল ব্যবহৃত।

টুথপেস্ট ছাড়াই দন্ত ধাবন

বিনা টুথপেস্টে দাঁত মাজার জন্য সৌরশক্তি চালিত টুথব্রাশ আবিষ্কার করেছেন দু'জন দন্ত-চিকিৎসক কুনিয়ো কোমি ইয়ামা ও গেরি আস ওয়াক। সোলাডে-ডি থ্রিএক্স নামে এই টুথব্রাসটিকে সোলার প্যানেল ও টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড রড সক্রিয় হয়ে ইক্টেন নির্গমন করে ধ্বংস করবে দাঁতের জীবাণু।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

প্রশ্ন ঃ এই হাসপাতালে কোনও বড় মানুষ জন্মেছিলেন কি?

উত্তর ঃ না তো, এখানে শুধু বাচ্চারা জন্মায়।

* * *

জজ সাহেব (মামলার শেষে) ঃ তুমি দোষী না নির্দোষ?

আসামী (বাঁকা হেসে) ঃ তা আমি কি জানি। আপনাকে অত টাকা মাইনে দিয়ে ওখানে বসিয়েছে, আপনি নিজেই বলুন।

* * *

হরেন ঃ একটা গল্প লিখব ভাবছি, কী করে শুরু করা যায় বল তো?

নরেন ঃ একদম প্রথম থেকে শুরু কর।

* * *

শিক্ষক ঃ বল তো, 'আমি দুধ খাই' এই বাক্যের দুধ শব্দটি কোন্ কারক?

ছাত্র ঃ বলকারক স্যর।

* * *

মা ঃ তুই এবারও ফেল করলি, ফেলু?

ফেলু ঃ করব না তো কী? তুমি আমার নাম ফেলু রেখেছ কেন?

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। ক্ষীণদৃষ্টি মানুষদের সুবিধার্থে ১০০ টাকার নোটে একটি বৈদ্যুতিন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা হয়েছে, সেটা কী?

২। এবারের কমনওয়েলথ গেমসের থিম সঙ্ কী? স্রষ্টা কে?

৩। বাংলার প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয় কাকে? —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রাজা রামমোহন রায় / ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৪। মহিষাসুরমর্দিনী ৮ জন অসুরকে বধ করেছিলেন। সেই অসুরগুলি কারা?

৫। এডমন্ড হিলারি কি উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার হিমালয় অভিযান করেন?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। একটি ত্রিভুজ

২। ইয়ারো ইন্ডিয়া বুলা লিয়া। এ আর রহমান।

৩। রাজা রামমোহন রায়

৪। মধু, কৈটভ, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ

৫। ইয়েতির সন্ধানে

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কাশ্মীর সমস্যা

ডাঃ প্রদীপ আচার্য

ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ভারত ও পাকিস্তানে ৫৫৬টি রাজ্য ছিল। তার মধ্যে অধিকাংশ রাজ্য ছিল বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এবং কয়েকটি রাজ্য ছিল পরোক্ষ শাসনাধীন। ওইসব রাজ্যকে মিত্র রাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

ভারতকে মুসলমানদের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়া হবে ওই সিদ্ধান্ত ১৯৪৭ খৃঃ বৃটেনের সর্বোচ্চ কক্ষে গৃহীত হবার পর বৃটেনের রাজা ওই বিলে স্বাক্ষর করেন ১৯৪৭ খৃঃ জুলাই মাসের ১৮ তারিখে। ভারতবাসী জেনে গিয়েছিলেন মুসলিম লিগের দাবী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মেনে নিয়েছে। দেশভাগ হয়ে গেলে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত কমে যাবে এমনটাই জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ভারতবাসীকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু হলে ভারতে যে এর প্রতিক্রিয়া হবে এবং তাতে কোটি কোটি মানুষ যে বিপন্ন হতে পারেন তেমন চিন্তা নেতাদের মনে আসেনি। দাঙ্গা বাধিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রায় এক বছর ভারতের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থেকে একদিকে যেমন বৃটিশ ভক্তদের ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে ভাল স্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন তেমনি কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করে নেহেরুকে দিয়ে সেই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে পাঠিয়ে ভারত ও কাশ্মীরের সর্বনাশ করে গেছেন। অথচ ওই মাউন্টব্যাটেন যখন লন্ডনে মারা গেলেন কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে ভারতবাসী তার জন্য এগারো দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করলেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকেই কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের মুসলমানদের উত্তেজিত করে আলাদা মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং বাধ্য হয়েই শেখ আবদুল্লাকে জেলে বন্দী করেন। শেখ আবদুল্লার ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নেহরু সাহেব প্রকাশ্যে সমর্থন করতেন। ব্যক্তিগতভাবে শেখ আবদুল্লা এবং নেহরুর মধ্যে গভীর বন্ধুত্বও ছিল।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে মাউন্টব্যাটেন হরি সিংকে পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও তিনি জানতেন হরি সিং তাতে রাজী হবেন না এবং ভারতের সঙ্গেও তিনি যোগ দেবেন না। অর্থাৎ তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করবেন। ওই মনোভাব হরি সিং মাউন্টব্যাটেনের কাছে প্রকাশ করার পর তৎকালীন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির পরামর্শ মতো মাউন্টব্যাটেন হরি সিংকে বৃটেনের তরফ থেকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন। বৃটেনের ইচ্ছে ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কাশ্মীরে আধিপত্য বজায় রাখতে পারলে এশিয়া মহাদেশে বৃটেনের স্বার্থরক্ষা করা যাবে। কারণ কাশ্মীরের

সঙ্গে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া ও ভারত এই পাঁচটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা যুক্ত রয়েছে। হরি সিংকে বিপাকে ফেলার জন্য এবং নেহরুর মতো মাউন্টব্যাটেনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাউন্টব্যাটেনের ইঙ্গিতে পাকিস্তান কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমণ করে। নাম দেওয়া হয় অপারেশন গুলবার্গ। ১৪ অক্টোবর ভারতে সামরিক উপদেষ্টা অচিনলেক-এর পরামর্শে গিলগিট অঞ্চলটি পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয় শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। গিলগিট অঞ্চলটির ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

২২ অক্টোবর পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করার পর সারা কাশ্মীরেই পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দেওয়ার আন্দোলন শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে হরি সিং জেলে বন্দী ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লাকে মুক্ত করে দিয়ে কাশ্মীরের আন্দোলনকে শান্ত করার প্রয়াস নেন। পাশাপাশি তিনি ভারতের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।

২৩ অক্টোবর মাউন্টব্যাটেন নেহরু এবং সামরিক উপদেষ্টা অচিনলেক-কে নিয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় হরি সিং ভারতের সঙ্গে যোগ না দিলে কোনও সামরিক সহায়তা দেওয়া হবে না। ওই সিদ্ধান্তে খুশী হতে পারেনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি নেহরুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, নেহরু যদি কাশ্মীরে অবিলম্বে বিমানে সেনা না পাঠায় তা হলে তিনি উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। নেহরু এতে বিচলিত হয়ে ডি জি মেননকে শ্রীনগরে পাঠান পরিস্থিতি দেখে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ডি জি মেনন শ্রীনগর সফর করে পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণের বিশদ বিবরণ নেহরুকে অবহিত করান।

২৩ অক্টোবর হরি সিং শেখ আবদুল্লাকে জেল থেকে মুক্ত করে দেন এবং কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করেন প্যাটেলের বন্ধু মেহেরচান্দ মহাজনকে। মেহেরচান্দ মহাজন হরি সিংকে পরামর্শ দেন কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য। সে অনুসারে ২৭ অক্টোবর হরি সিং ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

হরি সিং-এর ওই ঘোষণার পরই প্যাটেলের দাবী অনুসারে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর কর্ণেল রণজিৎ সিংরাই-এর সেনাপতিত্বে এক ব্যাটেলিয়ান শিখ রেজিমেন্টকে বিমানযোগে শ্রীনগর পাঠানো হয়। ওই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন কাশ্মীর।

ভারতীয় সেনারা যখন পাকবাহিনীকে হটিয়ে পাক দখলীকৃত কাশ্মীরের অংশ উদ্ধার করতে শুরু করে সে সময় মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে পরামর্শ দেন অযথা যুদ্ধ না করে তিনি যেন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং পাকিস্তান কর্তৃক দখলীকৃত কাশ্মীরের এলাকা পাকিস্তান যেন ছেড়ে দেয় তার জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করেন, না হলে ভারতে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। নেহরু যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে রাষ্ট্রসংঘে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানতে পেরে ভারতীয় বাহিনী নেহরুর কাছে এক সপ্তাহ পরে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ ওই সময়ের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী পাক দখলীকৃত ভারতভূমি উদ্ধার করতে সমর্থ হবে এবং পাকিস্তানের ভাগেরও কিছু অংশ দখল করে নেবে। কিন্তু নেহরু জম্মু-কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর শেখ আবদুল্লার দাবী মেনে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ ক্ষমতা ও সুযোগ দানের কথা সংবিধানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরকে যে সব বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তা এই রকম (ক) নিত্য প্রয়োজনীয় ১৪টি সামগ্রী জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের ভর্তুকীর মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে (খ) জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের অন্য কোনও অংশের মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে পারবে না। (গ) জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারতের যে কোনও স্থানে বসবাসের অধিকারী হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারা অনুসারে ওই তিনটি বিশেষ সুযোগ দেওয়ার ফলে কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে ভারতের বাকী অংশের মানুষের হৃদ্যতা গড়ে উঠার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং কাশ্মীরবাসীদের মনে ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয়। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারই জম্মু ও কাশ্মীর শাসন করে আসছে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের শেখ আবদুল্লা প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। তার আমলেই ঘোষণা করা হয়েছিল বিনা পাসপোর্টে কোনও ভারতীয় জম্মু ও কাশ্মীরে ঢুকতে পারেব না। ওই আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরে কারাবরণ করেন এবং কারাগারে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

শেখ আব্দুল্লার পর তার পুত্র ফারুক আবদুল্লা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ফারুক আবদুল্লার সময়েই কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অত্যন্ত বেড়ে যায়। জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে কেন্দ্র রাষ্ট্রপতি শাসনজারি করে। রাজ্যপাল জগমোহন যখন কঠোর হাতে জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হন তখন ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পি ডি পির দাবীতে জগমোহনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেস দলের সাহায্য নিয়ে পি ডি পি ও কংগ্রেস জোট জম্মু ও কাশ্মীর শাসন করেছে। বর্তমানে শেখ আবদুল্লার নাতি তথা ফারুক আবদুল্লার পুত্র ওমর আবদুল্লা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে জম্মু ও কাশ্মীর শাসন করছে। বর্তমানে আবার দাবী উঠেছে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা এবং রাজ্যের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া। গত ষাট বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে কেন্দ্রের জঙ্গিদের প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন এবং জঙ্গি নেতাদের দাবী মেনে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করে জম্মু ও কাশ্মীরকে আরও বেশী অশান্ত হতে সাহায্য করেছে। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে সেনা বাহিনীকে বলা হয়েছিল জঙ্গিরা আগে গুলি না ছুঁড়লে সেনাবাহিনী গুলি করতে পারবে না। কেন্দ্রের ওই নীতির ফলে জঙ্গিদের হাতে বহু সেনা ও অফিসার নিহত হয়েছেন। ওই ধরনের সিদ্ধান্তকে কোনও দেশের পক্ষেই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয়।

সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল ২০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখ থেকে তিন দিনের কাশ্মীর সফর করেছেন। হুরিয়ত নেতা গিলানী কিংবা পি ডি পি নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। প্রতিনিধি দল তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন। তাদের দাবী মেনে জম্মু ও কাশ্মীরকে আরও বিশেষ ক্ষমতা দিলে প্রতিবেশী দেশগুলো তার সুযোগ নিয়ে কাশ্মীরকে ভারত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রয়াস শুরু করবে। তার পটভূমিকা কিন্তু চীন ও পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে। সুতরাং জঙ্গিদের কাছে নতজানু না হয়ে জগমোহনের মতো প্রশাসক নিয়োগ করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে বিনাশ করতে পারলেই জম্মু ও কাশ্মীরে স্থায়ী শান্তি আসবে।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ

সঙ্ঘের উদ্যোগে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি স্মরণ সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে সারা দেশ জুড়ে আগামী ২০ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি স্মরণ দিবসের আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য, ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গে এই কার্যক্রম 'জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তি উদযাপন সমিতি'র-উদ্যোগে পালিত হবে। জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার, জনসভা, নাগরিক বৈঠক, বাড়ি বাড়ি পত্রক বিলি ও পুস্তক বিক্রি ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা হবে। বিশেষত, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানানোর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সমাবেশ সমাচার

শৈক্ষিক মহাসংঘের সম্মেলন

সম্প্রতি ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (উচ্চশিক্ষা) -এর উচ্চশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উচ্চশিক্ষার সমস্যা ও মোকাবিলা' শীর্ষক দ্বি-দিবসীয় একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০টি রাজ্য থেকে ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সম্পাদক অধ্যাপক নির্মল মাইতির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ এর পক্ষ থেকে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন অধ্যাপক/অধ্যাপিকা অংশগ্রহণ করেন এতে। সেমিনারে ৪১টি পেপার পঠিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্য বক্তা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও ভাষাবিদ ডঃ কপিল কাপুর শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পরম্পরার উপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্য— "চীন তাদের ওয়েবসাইট-এ ৫০০০ বছরের পরম্পরার দাবি করেছে। সেখানে তাদের ওয়েবসাইট-এ সংস্কৃতের কোনও উল্লেখই করেনি। Linguistics-এ পাণিনি, ভর্তৃহরি বা ভরতের নাট্যশাস্ত্র এখানে পড়ানো হয় না। কিন্তু একটি ছাত্র ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের অন্তর্গত 'অষ্টাধ্যায়ী' পড়লে তার মধ্যে গর্ববোধ জাগবে। এখন শিক্ষা পরিণত হয়েছে ব্যবসায়।"

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবাল আনীত বিলগুলির পর্যালোচনা করা হয়। National Commission on Higher Education and Research বিল আসছে। UGC, AICTE, প্রযুক্তি, চিকিৎসা সংক্রান্ত সব নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রয়াস চলছে। উপাচার্যদের কেন্দ্রীয় প্যানেল করার প্রস্তাব আছে। তার দ্বারা শাসকবর্গের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে। National Commission on Minorities Education স্থাপিত হয়েছে। সেখানে Minority University স্থাপনের প্রস্তাব আছে। এ পর্যন্ত সংখ্যালঘুরা স্কুল-কলেজ পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারত, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপেই পরিগণিত—সেখানে হিন্দু ছাত্ররাও পড়াশোনার সুযোগ পায়, কিন্তু এখন তা বন্ধ হতে চলেছে, এটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাধ প্রবেশের ফলে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যগুলির বিকৃতি ও বিতর্কের প্রভূত সম্ভাবনা আছে। যেমন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে— তারা ইতিহাসের মধ্যযুগ-বিষয়টি দিয়ে পঠন শুরু করতে চায়। আর এটিই ইতিহাসের বহুল বিতর্কিত বিষয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে সব রাজ্য শাখাতেই এরূপ আলোচনাচক্র আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সেমিনারে এ বি আর এস এম প্রকাশিত এবং শ্রী অজিত বিশ্বাস লিখিত বড়ন্দ্ব ত্রন্দ্ধ ত্রন্তুনন্দ্ধঞ্চনন্দদ্ধ—'Achary Prafulla Chandra Roy' পুস্তিকার উন্মোচন করা হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙেঘর বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ২১ দফা দাবীর ভিত্তিতে জেলা ডি আই অফিসে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ও প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার মাতৃস্বরূপা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা, বিকৃত ইতিহাস পাঠ বন্ধ করে স্বাভিমানপূর্ণ জাতীয় ইতিহাস পাঠ্য রূপে উপস্থাপিত করা, শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, শিক্ষাকে একটি স্বশাসিত সংস্থারূপে শিক্ষাবিদদের হাতে তুলে দেওয়া, জীবনশৈলীর নামে যৌনশিক্ষা বন্ধ করে আধ্যাত্মিক (যোগ শিক্ষাসহ) ও নৈতিক শিক্ষাদান চালু করা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার অপপ্রয়াস রোধ করা, প্রতি শিক্ষাবর্ষে ৫টি ইউনিট টেস্ট-এর বদলে ৩টি ইউনিট টেস্ট চালু করে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের দিন বৃদ্ধি করা, শিক্ষায় মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টিকারী পাঠ অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হয় ওই স্মারকলিপিতে। এ ছাড়া শিক্ষকদের 'Earn Leave' চালু করা ও ২০০৬ সালের এপ্রিল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসরকালীন সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার দাবীও জানানো হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা ব্যাপী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সংগঠনের কার্যকর্তাদের সাথে দাবীগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। স্মারকলিপি প্রদানের এই কার্যক্রমে সংগঠনের জেলা সম্পাদক আশীষ কুমার মণ্ডল, সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাদেশিক সমিতির সদস্য নবকুমার রায় ছাড়াও প্রায় ২৫ জনেরও বেশি শিক্ষক অংশ নেন।

'হিন্দি জনসাধারণের ভাষা'—দীনেশ বাজপেয়ী

'হিন্দি সাধারণ মানুষের ভাষা। সাধারণ মানুষই হিন্দিকে মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রীয় ভাষার আসনে স্থান দিয়েছে।' হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে গত ১৯ সেপ্টেম্বর এই কথাই বললেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন ডিজি দীনেশচন্দ্র বাজপেয়ী। অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা এইদিন বলেন 'এটা খুবই হতাশাজনক যে রাজ্যে স্বল্পপরিচিত ভাষা হওয়া সত্ত্বেও নেপালী ভাষাকে যেরকম স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার সিকিভাগও জোটেনি হিন্দি ভাষার ভাগ্যে। হিন্দি ভাষা আমাদের দ্বারাই বঞ্চিত। আমরা যদি একটু সজাগ হই তাহলে এই ভাষা তার মর্যাদা ফিরে পাবে।" এই উপলক্ষে বিখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র জানান, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়ার পেছনে বাংলাভাষীদের একটা বড় অবদান ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডঃ শঙ্করলাল পুরোহিত, পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী প্রমুখ নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন।

শ্রীশ্রী শতচণ্ডী মহাযজ্ঞ

মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তীর্থ তথা পর্যটন কেন্দ্র পাতালচণ্ডী পীঠে গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শ্রীশ্রী শতচণ্ডী মহাযজ্ঞ। পাঁচদিন ব্যাপি এই যজ্ঞানুষ্ঠান কাশী থেকে আগত বৈদিক বিদ্বান পণ্ডিতদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। যদিও এই অনুষ্ঠান চলাকালীন একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করে হিন্দুদের যজ্ঞানুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল প্রশাসন থেকে। পাতালচণ্ডী পীঠকে আরও জনপ্রিয় করা, এই ঐতিহাসিক স্থানে যাতে মানুষ বেশি করে আসে এবং দেশ তথা বিশ্বশান্তির জন্যই এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল বলে যজ্ঞ সংযোজক যোগীরাজ বৈদ্যবাবা এবং মালদা রামকল্যাণ চ্যারিটেবিল ট্রাস্টের আচার্য বালেন্দু মিশ্র জানিয়েছেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর গঙ্গাপূজা, মা-বোনেদের কলসী নিয়ে মণ্ডপ পরিক্রমা এবং অরণি মন্থন (কাঠে কাঠে ঘর্ষণ) করে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে যজ্ঞের সূচনা হয়। এই ৫ দিনে মালদা শহর এবং জেলার বহু স্থান থেকে দর্শনার্থী ভক্তদের সমাগম হয়। যজ্ঞের শেষ দিন পূর্ণাহূতি ও নরনারায়ণ সেবায় মানুষের ঢল নামে। যজ্ঞমণ্ডপ পরিক্রমা করার জন্য মানুষের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত এই পাতালচণ্ডী পীঠ আসার একমাত্র রাস্তাটি প্রশাসনের অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি। ফলে মালদা শহর ও দূর-দূরান্ত থেকে বৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত রাস্তায় এখানে আসতে প্রচণ্ড কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। বৈদিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে দেখে স্থানীয় মানুষ ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দেগঙ্গায় বীভৎস তাণ্ডব

(৭ পাতার পর)

চাঁদা তুলে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করেছে, সে কথাও মিথ্যা নয়। এর পেছনে ছিল আরও গভীর চাল। বেলিয়াঘাটায় ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু মাত্র তিন লক্ষ টাকা খরচ করে ক্ষতিগ্রস্তদের যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা যারা বুঝতে পেরেছেন, তারা ওই অনুগ্রহের দান গ্রহণ করেননি। যেমন, বিশ্বনাথ ঘোষ। আর যারা টাকা নিয়েছেন, তাদের একজন হলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষ ঘোষ।

চট্টলপল্লীতে গিয়ে দেখতে পেলাম দেগঙ্গা থানার সব পুজো কমিটির সদস্যরা স্থায়ী পুজো মণ্ডপের সামনে মিটিং করছেন। ফেরার পথে জেনেছি, এ বছর দুর্গাপুজো না করে তারা এই জঘন্য দাঙ্গার প্রতিবাদ করবেন। কয়েকদিন আগে মুসলমানরা থানায় গিয়ে ও সি সাহেবকে এই বলে হুমকি দেয় যে, চট্টলপল্লীর যে বিতর্কিত স্থানে কাটা ভিতের যে অংশ হিন্দুরা বন্ধ করে দিয়েছে, তার পরবর্তী ১৮ ঘণ্টার মধ্যে খুলে দিতে হবে। অন্যথায় হিন্দুদের দেখে নেওয়া হবে। এর পরপরই চট্টলপল্লীর দুর্গা মন্দিরের সামনে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। ওখানকার অধিবাসীরা জানালেন, গত ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার জমিয়ত উলেমা-এ হিন্দের মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ্ সাহেব ৮/১০টি লরীতে লোকজন নিয়ে 'শান্তি-মিছিল' করেছেন। তাদের প্রধান স্লোগান ছিল, 'দেগঙ্গার কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে'। তা ছাড়া 'বাচ্চু কর্মকারকে গ্রেফতার করতে হবে', নিহত সাহাবুদ্দিনের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা (ক্ষতিপূরণ দিতে হবে', দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি চাই' প্রভৃতি স্লোগানও দেওয়া হয়েছে। অতিথিদের মধ্যে সন্তোষ রাণা, রবীন্দ্র দেবনাথ, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস এবং সুকুমার বিশ্বাসের মতো দলিত মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তাদের উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু এরা সবাই উপস্থিত ছিলেন কিনা তা কেউ বলতে পারলেন না। কারণ, সবাই ছিলেন গাড়ির মধ্যে।

ঈদের পরপরই 'তেহলকা' ম্যাগাজিনের একজন সাংবাদিকের কাছে হাজী নুরুল ইসলাম বলেছেন, 'আমার কাছে খবর আছে, সি-পি-এম-এর ইয়াকুব এবং নিতাই ছিল এই সব লুটতরাজের নায়ক।' এই বক্তব্যের বিন্দুমাত্র সত্যতা আমাদের অনুসন্ধানে ধরা পড়েনি। হাজী সাহেব আরও দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত অনেক হিন্দুই ঈদের দিন তার সঙ্গে ঈদ উৎসব পালন করেছেন। এই বক্তব্যেরও কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা অরূপ বিশ্বাস ৮/১০ জন তৃণমূল সমর্থক নিয়ে হাজী সাহেবের সঙ্গে 'শিরনি' (ঈদ পালন?) খেতে গিয়েছিল। এদের মধ্যে একজনও ক্ষতিগ্রস্ত ছিল না।

সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করেছি, অভিশপ্ত ওই তিন দিনের পাশবিক কাজের পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত আছে কিনা। আমরা কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে দেখিছি, তারা কোনো দলকেই সরাসরি দায়ী করছেন না। সিপিএম-কেও নয়। তবে সিপিএমের কোনও নেতা বা ক্যাডারকে আমরা খুঁজে পাইনি। তাদের একটি অফিসও খোলা দেখিনি।

যে কেউ স্পটে গিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করলে বুঝতে পারবেন, ওই তিন দিনের ঘটনার পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে কোনো হিন্দু ছিল না।

ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত যারা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, তাদের কয়েকজন হলেন, সর্বশ্রী সুজিত মণ্ডল, হরেন্দ্রনাথ বক্সী, সুজিত কুমার ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, সুব্রত কুমার চৌধুরী, সুকুমার দে এবং বিকাশ চন্দ্র ঘোষ। স্থানীয় বাসিন্দারা কেবলমাত্র বেলিয়াঘাটা বাজারের ৬০ জন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের নামের একটি তালিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, খেজুরিডাঙ্গায় অভিলাষ ঘোষ দেগঙ্গা থানায় ৫৯ জন মুসলিম দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ব্যতিক্রমী পাঠক্রম

(১২ পাতার পর)

যোগ্যতা ঃ

সাধারণ স্নাতক হয়ে কিংবা কোথাও কাজ করতে করতে এই বিষয়ের কোর্সে যোগ দেওয়া যায়।

কাজের সুযোগ রয়েছে রপ্তানি সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে কিংবা কন্‌সালট্যান্সিতে।

এ বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স করা যায়।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ফরেন ট্রেড-এ (www.iift.edu) ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস-এর ওপর বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। সাধারণ স্নাতক তথা কর্মরতরা এইসব কোর্সে যোগ দিতে পারেন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কিছু অনলাইন কোর্সও আছে। ইগনু (www.ignou.ac.in) থেকে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অপারেশনস-এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমার জন্য করেসপন্ডেন্স কোর্স-ও করা যায়। কলকাতার সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজেও ফরেন ট্রেড প্র্যাক্‌টিসেস্ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-এ একটি ছ'মাসের সার্টিফিকেট কোর্স রয়েছে।যোগ্যতা স্নাতক।

দুর্গাপুজোর জানা-অজানা

(৮ পাতার পর)

সন্তুষ্টা হয়ে এক কুমারীদেবী আবির্ভূতা হয়ে দেবীর বোধন করে পুজোর নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশ মতো ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীতে এসে ঘুরতে ঘুরতে এক নির্জন স্থানে বেলগাছের একটি পাতায় সোনারবরণ এক শিশুকন্যাকে নিদ্রিতা দেখে তাঁকেই বিশ্বপ্রসবিনী জগজ্জননী মহামায়া বলে স্তব করেছিলেন। ব্রহ্মার সেই স্তবেই শিশুকন্যা জাগরিতা হয়ে দেবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং দেবতাদের অভীষ্টপূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।মূলত আমাদের দেবী আরাধনা মৃন্ময়ীর নয়, সে যে চিন্ময়ীর আরাধনা। রমণীর মাঝে জননীর দর্শন, এক প্রকৃতির মাঝে বিশ্বপ্রকৃতির অবলোকন— তা সহজ সরল ভাবে বুঝিয়ে দিতেই শাস্ত্রকারেরা কুমারী পুজোর নির্দেশ করেছেন।

বিজয়াদশমী ঃ

বিজয়ার যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভাসে তা হলো প্রতিমার চলে যাওয়া। শরৎকালে সীতা উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করে দেবীর পুজো করেছিলেন। দেবীর আশীর্বাদে রাবণকে নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। তাই প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিজয়া হলো— রাবণের পরাজয় আর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়ের দিন। বিজয় উৎসব থেকেই বিজয়া কথাটি এসেছে। এই দিন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করে বধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে বিষ্ণু ইন্দ্রের রথের সারথি ছিলেন আর মরুদগণ ছিলেন সহকারী।

রাইটার্সে মমতা বাংলার সর্বনাশ তৃণমূলী জল্লাদদের হাতে নারীর ইজ্জতনাশ

শিবাজী গুপ্ত

সর্বনাশের আর বেশি বিলম্ব নেই— সাড়ে সর্বনাশ কাঁধের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। ৬৪ বছর পূর্বেকার পূর্ববঙ্গের/পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর প্রযুক্ত হত্যা লুণ্ঠন গৃহদাহ, নারীধর্ষণরূপ ইসলামী সংস্কৃতি কনগাঁ-বসিরহাট সীমান্ত ডিঙিয়ে দেগঙ্গায় ঢুকেছে, গঙ্গা পর্যন্ত এগিয়ে আসতে আর কত বাকী। একদিকে মুসলিম গুণ্ডাবাহিনী, অপরদিকে পোষ্য বুদ্ধিজীবী বাহিনী— এই দুই বাহিনীর সওয়ার হয়ে যিনি রাইটার্সে ঢোকার জন্য অপেক্ষমান তার কাছে বাংলার হিন্দু নারীর মান-সম্মানের কোনই নিরাপত্তা নেই। প্রমাণ— দেগঙ্গার মা-বোনেদের উপর মুসলমান গুণ্ডাদের অকথিত নির্যাতন। লোকজন ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে ঃ

বাংলার হিন্দুনারী থাকো সাবধান
মমতার সঙ্গে আছে গুণ্ডা মুসলমান।

নোকরি চাকরি পদ পদক ও নগদ পুরস্কার দিয়ে দিয়ে তো দুর্বৃত্ত বুদ্ধিজীবীদের মুখ বন্ধ করেছে, মাথা কিনে নিয়েছে; আর দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকাগুলিকে দাসানুদাস বানিয়েছে। সকালবেলা কাগজ খুললেই দেখি সবুজ পতাকা নেড়ে মুসলমানদের যেন গ্রীণ সিগন্যাল দিচ্ছে। তা না হলে কলকাতা থেকে ২৫-৩০ মাইল দূরে দেগঙ্গায় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার খবর সংবাদপত্রগুলি একদম চেপে যায় কেন? ওই দাঙ্গার খবর ও বীভৎসতার দৃশ্য আমাদের ইন্টারনেট থেকে জানতে হয় কেন? মমতার পা-চাটা আর রাহুল গান্ধীর জুতা-মোছা সাংবাদিককুল ও সংবাদপত্র মালিকগোষ্ঠী বাংলার ঐতিহ্যময় সংবাদপত্রের গায়ে কলঙ্ককালিমা লেপন করেছে।

কি ঘটেছিল দেগঙ্গায়? প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রদত্ত মর্মন্তুদ বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ

"গত ৬, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ দেগঙ্গা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রায় ৮টি গ্রাম ও বাজারে কয়েক হাজার হিন্দুর বাড়ি ও দোকান লুট হয়ে গেল, ৫টি হিন্দু মন্দির ভাঙা হল ও অপবিত্র করা হলো, বহু হিন্দু বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো, বহু হিন্দু আহত হলো, অনেক হিন্দু নারীর অসম্মান হলো। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতে পারলো না। কারণ খবরের কাগজ ও মিডিয়া চুপ। তাই সাধারণ মানুষকে হিন্দুর উপর এই অত্যাচারের কথা জানাতে হিন্দু সংগঠনগুলি আজ রাস্তায় নেমেছে।

দেগঙ্গা থানার ঠিক পাশে চট্টলপল্লীতে ৪০ বছরের পুরানো একটি দুর্গাপূজা ও মুসলিমদের একটি কবরস্থানকে কেন্দ্র করে একটা সামান্য বিবাদ ছিল। তারই পরিণামে হিন্দুর উপর হলো এই গণ অত্যাচার। ৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার বেলা ১১টা থেকে হিন্দুর উপর মুসলিমদের এই প্রচণ্ড অত্যাচারকে থামাতে জেলা প্রশাসন ১৫টি থানার আই সি, ও সি ও পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে এসেও উন্মত্ত মুসলিম জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। র‍্যাফও পারেনি। বহু পুলিশ, র‍্যাফ, দুজন ডি এস পি, দেগঙ্গার ও সি ওই মুসলমানদের হাতে মার খেয়েছেন। আর হিন্দুরা হারিয়েছে সবকিছু, হয়েছে নিঃস্ব। ৬ তারিখ রাত্রিটা নিরাপদে কাটলেও ৭ তারিখ সকাল থেকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই আবার পুড়ল হিন্দু গ্রাম, লুট হলো হিন্দুর বাড়ি ও দোকান। এই তিনদিনে ৩টি বড় বাজারে বেলিয়াঘাটা, দেগঙ্গা ও কার্তিকপুরে হিন্দুদের কয়েকশো দোকান সম্পূর্ণ লুট হয়ে গেল। কার্তিকপুর, দেগঙ্গা, বুড়ির দরগা, থানা পাড়া, হাসপাতাল পাড়া ও আরো কয়েকটি গ্রামে হিন্দুর বহু বাড়ি লুট হলো, ভাঙা হলো ও পোড়ানো হলো। মেয়েদের গায়ে হাত পড়ল।

আর দেগঙ্গা বাজারে কালীমন্দির, বিপ্লবী কলোনি কালীমন্দির, কার্তিকপুর শনিমন্দির, খেজুরডাঙ্গা দুর্গামন্দির, বেলেঘাটা নির্মীয়মান হরিমন্দির ভাঙা হলো ও অপবিত্র করা হলো। প্রশাসন এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার ও পবিত্রতা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর সবথেকে লজ্জার কথা যে একজন জনপ্রতিনিধি, বসিরহাটের এম পি হাজি নুরুল ইসলাম প্রথমদিন এই তাণ্ডবে প্ররোচনা দিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে তাঁর প্ররোচনায় দেগঙ্গা বাজারের মসজিদে জোর করে মাইক লাগিয়ে দেওয়া হলো।

মুসলিম ভোট লোভী রাজনৈতিক দল— শাসক সি পি এম ও বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারে নীরব। অথচ বাবরি মসজিদ ও গুজরাটের ব্যাপারে এরা কতো চিৎকারই না করেছেন। তাই হিন্দু আজকে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে ভারতে হিন্দুরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? আর বাংলার হিন্দু ভাবছে— একবার বাংলা ভাগ হয়েছে, হিন্দু রিফিউজি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্লজ্জ আত্মঘাতী মুসলিম তোষণনীতির ফলে আর একবার কি বাংলার হিন্দুকে রিফিউজি হতে হবে?

আজ উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা দুই জেলাতেই বহু স্থানে হিন্দুর প্রাণ, সম্পত্তি, সম্মান ও ধর্ম বিপন্ন। দুই জেলাতেই বহু ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। বহু এলাকাতে মিনি পাকিস্তান তৈরি হয়ে গিয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বাড়ছে। তাই হিন্দুর ভাগ্যে আর এক চরম দুর্যোগ নেমে আসছে।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করতে করতে মনে হলো আমরা যেন ৬৪ বছর পূর্বেকার ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের নোয়াখালী দাঙ্গার বিবরণ পড়ছি— তফাৎ একমাত্র এই ঃ তখন হিন্দুদের বিপদের দিনে সারা ভারতের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দ জীবন তুচ্ছ করে হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর আজ স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলায় মুসলমান দুর্বৃত্তদের হাতে নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।

"আমাদের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী (!) মমতাদি কোথাও কোনো অঘটন ঘটলেই সেখানে ছুটে যান। যাননি শুধু দেগঙ্গায়। তাহলে সেখানে কোনও অঘটন কি ঘটেনি?

আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী (!) রাহুলজী কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে ঘুরলেন, কিন্তু তাঁর মুখে দেগঙ্গা সম্পর্কে একটি শব্দও শুনলাম না। কংগ্রেসীরা কি তাকে কোনও তথ্য দেননি? দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিক সুকুমার মিত্র ঢালি পাড়ায় হিন্দু মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছে মুসলমানরা, এ খবর পেলেন, কিন্তু খেজুরিডাঙ্গার বকসী বাড়ির ৮ জন হিন্দু মুসলিম পাড়ায় আশ্রয় পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, সে খবর রাখেন কি? আর তিনি 'ভাড়াটে হিন্দুত্ববাদী' শব্দ দু'টি ব্যবহার করলেন (দি স্টেটসম্যান, ১৯.৯.'১০) কিসের ভিত্তিতে? নিজেকে 'ভাড়াটে' সাংবাদিক প্রমাণ করার জন্য?

লক্ষ লক্ষ বাঙালি যারা মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দিয়ে ইহলোকের সব শোক-তাপের অবসান ঘটাতে চান, যারা বিশেষ 'ব্যাজ' পরিয়ে ভক্তদের বৈকুণ্ঠে পাঠাবার গ্যারান্টি দেন, যে তারা ইসলাম শব্দের অর্থ করেন, 'আই স্যাল লাভ অল ম্যানকাইণ্ড' (I shall love all mankind), যারা স্বর্গের পরিবর্তে 'রামকৃষ্ণলোক' বানিয়েছেন, তারা এখন কোথায় আছেন? কোথায় আছেন নাথ বাবার ভক্তরা, জন্মসিদ্ধ ঠাকুরের অনুগামীরা এবং ঠাকুর চন্দ্রের অনুসারীরা? তারা কি এখন কীর্তন করছেন, ধ্যান করছেন, না বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য নতুন কোনো 'ব্যাজ' তৈরি করছেন? কয়েক ঘন্টার জন্য এই কাজ বন্ধ করে দেগঙ্গায় গিয়ে দেখে আসুন হাজী ভিতুমীরের উত্তরসূরী একালের হাজীরা কী সব প্রেমের কাণ্ড ঘটাচ্ছেন।

সিপিএম-এর অনেক পার্টি অফিস চোখে পড়ল। একটিও খোলা ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও 'সত্যবাদী' বিমান বসুর কোনও অনুগামীকে খুঁজে পাইনি। তাদের কাছে প্রশ্ন, প্রায় ৫০ বর্গ কিমি এলাকায় যে সব হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, "তারা কি সবাই শ্রেণী শত্রু? আর আফিম কি শুধু হিন্দু ধর্ম?"

মমতাবাদী অনুগ্রহপুষ্টে বুদ্ধিজীবীর দল শান্তি রক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান করেছে। এটা কি ধরনের কথা হলো? হিন্দুরা আক্রান্ত, মুসলমানরা আক্রমণকারী— এখানে হিন্দুদের কাছে শান্তির আবেদনের মানে কি? হিন্দুরা কি মুসলমানদের আক্রমণ করতে গেছে? এটা যেন কাউকে কেউটে দংশন করলে কেউটের কাছে হাত জোড় করে বলা— বাবা কেউটে, তুই এখন আর কামড়াস না, বিষের থলিতে পুনরায় বিষ জমা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর দংশিত ব্যক্তিকে বলো— বাপু হে! তুমি চেঁচামেচি করো না, তাগা বেঁধো না, ওকে ডেকো না, হাসপাতালে যেও না— মরে গেলে আপনিই বিষ নেমে যাবে। বুদ্ধিজীবীদের সে হিম্মৎ হলো না যে— গুণ্ডাদের ধরো এবং শাস্তি দাও বলতে। থাকবে কি করে? অনুগ্রহপুষ্ট উচ্ছিষ্টভোজী বুদ্ধিজীবীদের সে সাহস কি কখনো হয়?

মরার আগেই শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে

বিশাখা বিশ্বাস

তখন কোঠারি কমিশন বলেছিল, রাজস্ব সংগ্রহের আদলে না এনে শিক্ষাকে ধীরে ধীরে আবৈতনিক এবং সকলের জন্য আবশ্যিক করতে হবে। তখন সারা ভারতেই কংগ্রেস জমানার সময় এবং সিপিআই(এম) পার্টি তখন গরীব মানুষের দরদীয়া পেটেন্ট-হোল্ডার। অতএব পরণের ধুতিখুলে গলায় জড়িয়ে পতাকাখানিকে কৌপিনের মত করে পরিধান করে কোঠারি কমিশনকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অবৈধ সন্তান ভারত সরকারের তখন তারা শ্রাদ্ধকর্ম সম্পাদন করতো। তখন সেটা ছিল ছয়ের দশকের শেষের দিকের কাল।

তারপর দেশের রাজ্যে-রাজ্যে নানান জাতের সরকার এসেছে, সারা দেশেই পরিবর্তন এসেছে, গরীব মানুষের সেই দরদীয়া পেটেন্ট-হোল্ডারেরা জনগণের কল্যাণবিহীন স্বার্থ, সভ্যতা ও শাসনবিহীন সমাজ, মনুষ্যত্বহীন মানবিকতা, সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা এবং গণকবরের ওপর গণতান্ত্রিকতার ইমারত গঠনে অনেক মাল-মশলা মিশিয়ে ইংরেজী ও বাংলার মহাসমন্বয় ঘটিয়ে 'বামফ্রন্ট' নামক শাসন-শোষণ-হত্যা-ধর্ষণ-রিগিং-জালিয়াতির ইসলামীয় 'তাজ মহলটি' রচনা করেছেন (তাজ এবং মহল কোন শব্দই ঐস্লামিক নয়— হোসেনুর রহমান)। এখন টাটা-বিড়লা-আম্বানিরা বলছেন, এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে লগ্নি করলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা তো নেই-ই পরন্তু প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা আছে। পুঁজিপতির লগ্নিপুঁজির নিয়োজিত বরপুত্র বুদ্ধ-নিরুপম-রেজ্জাক-গৌতমেরা এবারেও সেই শিল্পপতিদের ধুপে-চন্দনে, পুষ্পে-পত্রে পূজারতি শুরু করেছে এবং এখন এটা দু'হাজার সালের প্রথম দশকের অন্তিম সময়।

আসলে তেত্রিশ বছরের বামবাদী সরকার এবং শাসকটি ধরে ফেলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে মন্দার থাবা থেকে পরিত্রাণের আশু আশায় মরীয়া পুঁজিপতিরা অনুন্নত রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষায় বিনিয়োগ করে টিকে থাকতে চাইছে এবং সেই সুযোগে ভালোভালো কথার আড়ালে এ রাজ্যের বামমার্গী লুঠেরারা এরাজ্যে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, ব্যবসায়ীকরণ এবং বেসরকারীকরণের কর্মটি পুরোদস্তুর সম্পাদন করে ফেলেছেন। শিক্ষার উৎকর্ষ অন্তর্ভুক্তি এবং সম্প্রসারণের নামে শিক্ষাকে এরা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত করে রেখেছেন— কেবল নয় থেকে দশ সালের মধ্যেই সারা রাজ্যে নানান জাত-গোত্রের যে আটাশটি কলেজ খোলা হয়েছে, তার মধ্যে উনিশটিই সেল্ফ ফাইন্যানসিং কলেজ। সেখানে টাকা ফেলেই অধীত বিদ্যাকে ক্রয় করতে হবে। শিক্ষাকে সকলের কাছে নিয়ে যেতে চান বলে ছয়ের দশকে যারা কোঠারি কমিশনের সুপারিশকে অভিনন্দিত করেছিলেন— অভ্যস্ত মিথ্যাবাদী, সহজাত মিথ্যাচারী, অসংশোধিত অনৃতভাষী, নাগী মিথ্যাবাদী, গোয়েবেলসীয় মিথ্যাবাদী— কোন্‌টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পাঠক?

ইউ জি সি-র চেয়ারম্যান দেশমুখ একবার বলেছিলেন, উই শুড রেসট্রিক্ট হায়ার এডুকেশন টু মিনিমাইজ দ্য নাম্বার অব এডুকেটেড আন-এমপ্লয়মেন্ট— শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমাতে শিক্ষাকে সংকুচিত করতে হবে। সেদিন যেসব মার্ক্সবাদী বীরপুঙ্গবেরা দেশমুখের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিলেন, মার্ক্সীয় শাসনের তেত্রিশ বছরের পুরনো মল্লভূমিতে বসে শিক্ষাবঞ্চিত, দীক্ষারোহিত, বিবেক লুণ্ঠিত সেইসব লাল বর্বরেরাই জাল পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপির মাথা ভাঙছেন, মেধা-কে পাছা দেখাচ্ছেন, কাউকে দমদম দাওয়াই দিচ্ছেন, কারো লাইফ হেল করে দিচ্ছেন, রিগিং-জালিয়াতি কারচুপি করে তেত্রিশটি বছর ধরে ভোটে জিতছেন, লালপতাকাকে সোনিয়ার দরবারে বাঁধা রেখে হাইটেক রিগিংয়ের তত্ত্বকে পরিহাস-উপহাস করে অবশেষে ই ভি এম মেশিনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে দরবার করছেন, সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে 'নতুন সূর্যোদয়ের' পরে জঙ্গলমহলে ভোরের কাক ডাকাচ্ছেন এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রেও লালবর্বরতা ও অসভ্যতার আমদানী করে চলেছেন। এরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছেন— ফলে, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রসমাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা পড়তে পারে না, অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজী বোঝে না, বি. এস. সি-র ছাত্র সপ্তম শ্রেণীর ইংরাজী পড়াতে পারে না (সিদ্ধান্ত-অশোক মিত্র কমিশনের)। চতুর্থ শ্রেণীর শেষে এরাজ্যে ষাট শতাংশ ছাত্র স্কুল ছেড়ে দেয় মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে এই হার এখানে উন্নীত হয় প্রায় পঁচাত্তর শতাংশে। আবার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর যে সংখ্যা এরাজ্যে থাকে বত্রিশ লক্ষের কাছাকাছি, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সেই সংখ্যাই হয়ে দাঁড়ায় সাতলক্ষের সামান্য বেশী। এরা একাদিক্রমী পরীক্ষাপদ্ধতিতে 'মাইনাস' হয়, এরা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'মাইনাস' হয়, (এবং কে না জানেন) মাইনাসে মাইনাসেই এরা 'প্লাস' হয়। মাত্র দুটি ডাহা মিথ্যার 'মাইনাস'কে পাশাপাশি জুড়তে পারলেই মহাসত্যের 'প্লাস' পাওয়া যায়। অতএব "ভারতের অনেক রাজ্য থেকেই আমাদের রাজ্যে শিক্ষা অনেক ভালো।" এরই নাম মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক মিথ্যাচার!

প্রকৃত শিক্ষাকে ধ্বংস করতে আশিজন ছাত্রপ্রতি একজন শিক্ষক রাখা হয়েছে, অতীতে যৌনসচেতনতা বৃদ্ধির নামে ছাত্রসমাজে যৌনাচারের আমদানী করা হয়েছে, ছাত্র ধরার নামে স্কুলে লঙ্গরখানা খুলে দিয়ে কেন্দ্রের টাকা লুটের আংশিক ব্যবস্থা করা হয়েছে, সর্বশেষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল নিয়মকে বিদেয় দেওয়া হচ্ছে। কীর্তনে দোহারেরাই কীর্তনের সুরটাকে জমিয়ে রাখে— শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষার মানোন্নয়নের মিথ্যার স্বপক্ষে বিমান-বুদ্ধ-গৌতম-মানব থেকে জালি ডক্টরেট এবং হালি প্রলেতারিয়েত কমরেডকুল পর্যন্ত সবাই কোরাসকণ্ঠে কথা বলেন।

অতএব হ্যাঁ, এখন লড়াই-ই চাই। লড়াই করেই এখন শিক্ষাকে বাঁচানো চাই। যে শিক্ষা একদিন দেশ ও জাতিকে সেবার স্বার্থে ছাত্রসমাজকে গড়ে দিত, দেশ ও জাতির রক্ষার্থেই আজ সেই ছাত্রসমাজকেই লড়াই, লড়াই, লড়াই করেই সেই শিক্ষাকেই বাঁচাতে হবে— এ ছাড়া বাঁচার অন্য কোনও পথ নেই, উপায় নেই।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

আদালতের রায়ে অযোধ্যায় খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পরতে পরতে বদলে যাচ্ছে রঙ। গত সপ্তাহভর অযোধ্যা জুড়ে নানা রঙের ক্যানভাস। কখনও হতাশা, কখনও আশা, কখনও বা সংশয়ের গাঢ় রঙ। তবে ৩০ সেপ্টেম্বরের পর ফের চেনা ছন্দে অযোধ্যা। উচ্ছ্বাস আছে, তবে তা সংযত। জয়ের অভিমান নেই, রয়েছে আত্মতৃপ্তির আনন্দ। অযোধ্যা খুশি, কারণ অযোধ্যা 'রামজন্মভূমি'। এই স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে কেটে গেছে প্রায় ছ'দশক, তবু অযোধ্যা আনন্দিত কারণ 'জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড'— এই আপ্তবাক্যটি অযোধ্যা-মামলার রায়ে অন্তত প্রযোজ্য হয়নি। ৩০ সেপ্টেম্বরের রাতে তাই অযোধ্যাবাসীর ঘরে ঘরে অজস্র আলোক-দীপমালা। রায় ঘোষণার দিন সকাল থেকেই সতর্ক ছিল অযোধ্যা। দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সবকিছুই ছিল বন্ধ। অযোধ্যা আর পার্শ্ববর্তী ফৈজাবাদ— ওইদিন সকালেও এক অজানা আশঙ্কায় ভুগেছে। অবশ্য কিছু দোকান-পাট যে খোলেনি তা নয়, তবে দুপুরের পর থেকেই সব বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ প্রহরা, নিরাপত্তারক্ষীদের টহল; যেন শহর জুড়ে জারি হয়েছে কার্ফু। গোটা তল্লাট শুনশান।

ঘড়ির কাঁটায় তখন তিনটা বেজে ত্রিশ মিনিট। সারা দেশের সঙ্গে অযোধ্যাবাসীর চোখ টিভির দিকে। প্রতি সেকেন্ডকে তখন এক এক ঘণ্টা বলে বোধ হচ্ছে। সময় গড়াতে দেখা গেল টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে মামলার রায়দান শেষ। মামলায় অংশগ্রহণকারী আইনজীবীদের 'বাণী' শোনার জন্য সংবাদমাধ্যমের হুড়োহুড়ি। বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের ক্যাপশনে ফুটে উঠছে সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ডের দাবি খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ। অযোধ্যাবাসীর মনে অধীর উত্তেজনার ছোঁয়া। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। চারটে বেজে পঁচিশ মিনিটে এল কাঙ্ক্ষিত রায়। অযোধ্যার সেই জমির গা থেকে 'বিতর্কিত' তকমা ঘুচল। অযোধ্যার জমিকে আদালত ঘোষণা করল রামজন্মভূমি হিসেবে। অধীর জনতা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে পথে নামল। অলি-গলি থেকে সাধু-সন্তদের আখড়া যেদিকেই কান পাতা যায়, শুধুই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। খুলল দোকান-বাজার; দুপুর থেকে যেটাকে কার্ফু বলে ভ্রম হচ্ছিল, সেটাকেই তখন সপ্তমীর দক্ষিণ কলকাতায় মধ্যরাতের পুজো-মণ্ডপের জনজোয়ার বলে মনে হলো। যেদিকেই তাকানো যাচ্ছে, সেখানেই কাতারে কাতারে লোকের মিছিল, মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি।

আনন্দ-উৎসবে সামিল অযোধ্যার মুসলমানরা। সবাই না হলেও, অধিকাংশই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেও ফেলছেন, ''কোর্ট যখন বলছে অযোধ্যার ভূমি রামজন্মভূমি, তখন পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনার মতো এক তৃতীয়াংশ জমি নিয়েই মুসলমানদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত কাজ হবে না।''

করসেবকপুরম, ১০ একর জমি রামজন্মভূমি ন্যাসের সদর কার্যালয়ে তখন অন্য দৃশ্য। নিত্যগোপালজীকে ঘিরে সেখানে তখন আনন্দোৎসব। জয় শ্রীরাম ধ্বনি। তাঁরই ফাঁকে তিনি বললেন, ''পুরো অধিগৃহীত জমিটাই যখন রামজন্মভূমি তখন এক-তৃতীয়াংশ জমি সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ডকে কেন দেওয়া হলো তা সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানতে চাইব।''

প্রকাশিত হল
ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও নতুন সাজে
স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা - ১৪১৭
বিস্ময়ের বাস্তব

উপন্যাস
● নবকুমার বসু ● সুমিত্রা ঘোষ ● দীপঙ্কর দাস
● বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
● গোপালকৃষ্ণ রায় ● এষা দে ● জিষ্ণু বসু ● রমানাথ রায়
● শেখর বসু ● সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ● বাদল ঘোষ
● গোপাল চক্রবর্তী

রম্য রচনা
● চণ্ডী লাহিড়ী

ছড়াকাহিনী
● পতিতপাবন গৌরসুন্দর ঃ শিবাশিস দত্ত

প্রকাশিত হল
মূল্য ৪০ টাকা।

প্রবন্ধ
মহাশক্তি মা দুর্গা ● স্বামী বেদানন্দ
হিন্দুত্ব ও ভারতীয় যুবসমাজ ● দত্তাত্রেয় হোসবালে
ভারতের পরমাণু প্রযুক্তির স্থপতি
ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ● দেবীপ্রসাদ রায়
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রতিমূর্তি ঃ জীবনে ও
মননে রমেশচন্দ্র দত্ত ● প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
অমর কিশিং ঃ মুসলিম দেশে দেশে ●
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
সেকুলারবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্ববাদী
বলবে না তো! ● হীতেশ চন্দ্র সিংহ
আলোকোজ্জ্বসিত তারাশঙ্কর - তাঁর কথাসাহিত্যে
ভারত চেতনা ● অচিন্ত্য বিশ্বাস
হরপ্পীয় থেকে ব্রাহ্মী ঃ লিপির বিবর্তন ●
সুমিত চক্রবর্তী
উষাকাল থেকে উনিশ শতক ঃ বাংলার
ভ্রমণ কথা ● অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
চিলেকোঠায় বঙ্গজীবন ও বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ●
অর্ণব নাগ
গৌড়ীয় নৃত্য ● কাবেরী পুততুণ্ড কর
সাধনা ও সাধকের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ●
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গান ● সন্দীপ কুমার দাঁ
আম আদমীর দেবতা ● বিজয় আঢ্য

স্বস্তিকা
দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা
৮ নভেম্বর, '১০ প্রকাশিত হবে

গান্ধীজী তাঁর জনসভা শুরু করতেন রামধুন দিয়ে। ভারতবাসীর মানসপটে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের যে ছবি রয়েছে বিশ্বের কোনও শক্তিই তা মুছে দিতে পারেনি। বাবর চেয়েছিল, অযোধ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রামমন্দির ও রামের মহিমা লোপাট করতে। রামমন্দিরের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল ৭২ বার। শত সহস্র শহীদের রক্তপাত ও লক্ষ লক্ষ করসেবকদের আত্মত্যাগে শ্রীরাম আজও অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত। রাম ও রামজন্মভূমি আন্দোলন নিয়ে এবারের অনবদ্য প্রয়াস -- 'রাম ও রামজন্মভূমি আন্দোলন'

লিখছেন ঃ- শ্রীমদ্ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রীতিমাধব রায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, সংকর্ষণ মাইতি, বাসুদেব পাল, নবকুমার ভট্টাচার্য, অর্ণব নাগ প্রমুখ।

রঙিন প্রচ্ছদ।। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।। দাম ছয় টাকা।।
২৫ অক্টোবরের মধ্যে কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com